দুই নারী, হাতে তরবারি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

অমিতার সকাল

আজ কুহু আসবে। ভোর সাড়ে পাঁচটায় সে ফোন করেছিল। মেয়েটা কক্ষনও সময়-অসময় মানে না। কে কখন ঘুমোচ্ছে কিংবা ফোন ধরার সুবিধে আছে কি না, তা চিন্তাও করে না। রাত দু'টোর সময় ফোন বাজলে হঠাৎ ভয় লাগে, কোনও দুঃসংবাদের আশঙ্কা হয়। দেশ থেকে কেউ কেউ সময়ের হিসেবটা গুলিয়ে ফেলে ও রকম রাত্তিরে ফোন করে বসে। তবে এখন অমিতার অভ্যেস হয়ে গেছে। অসময়ের ফোন মানেই কুহু। হয়তো নিতান্ত একটা তুচ্ছ কথা বলবে।

আজ ভোরে ফোন করে কুহু জানিয়েছে, মা, আমি আসছি, সারা দিনটা তোমার সঙ্গে কাটাব। রাত্তিরেও থাকতে পারি। একটু পরেই বেরুব।

গাড়ি চালিয়ে আসতে ঘণ্টা চারেক অন্তত লাগবে। অবশ্য কুহুর একটু পরে মানে ঠিক কতটা পরে তা বলা শক্ত।

এখন সকাল ন'টা। অমলেশ বেরিয়ে গেছেন সাড়ে সাতটায়, ক'দিন ধরে একটু একটু জ্বর হচ্ছে বলে অমিতা চার দিন ছুটি নিয়েছেন। এ বছর আর দেশে যাওয়া হবে না বলে হাতে ছুটি জমে আছে।

কিচেনের জানলার ধারে বসে দ্বিতীয় কাপ চা খাচ্ছেন অমিতা। সকালবেলা কাপের পর কাপ চা খাওয়া একটা বিলাসিতা, সারা সপ্তাহে সে সুযোগ পাওয়া যায় না, অমিতাকেও কাজের দিনে সাড়ে সাতটার মধ্যে বেরিয়ে যেতে হয়। আর উইক এন্ডেও এত বাড়ির কাজ জমে থাকে যে এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকার অবকাশ হয় না।

দু'একটা গাছের পাতা মধ্যে মধ্যে লাল হতে শুরু করেছে। শরৎ এসে গেল। দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই কিছু কিছু গাছ পুরোপুরি লাল হয়ে যাবে। ফল কালার। অন্যান্য স্টেট থেকে দেখতে আসবে অনেকে।

অমিতার মনের মধ্যে একটু খচ খচ করছে। কুহু হঠাৎ আসছে কেন সপ্তাহের মাঝখানে? আজ বুধবার। খেয়ালি মেয়ে কিন্তু অফিসের কাজের ব্যাপারে তো খুব সিরিয়াস। শরীর খারাপ নয় নিশ্চয়ই, তা হলে একটা গাড়ি চালিয়ে আসার ঝুঁকি নিত না।

মায়ের জ্বর হয়েছে বলে দেখতে আসছে? অত কিছু মাতৃভক্ত নয় কুহু। অনেক সময় সারা সপ্তাহ ফোন করার কথা মনে থাকে না মেয়ের। অমিতাকেই খোঁজখবর নিতে হয়। প্রদীপ বরং নিয়মিত দু'দিন অন্তর ফোন করে।

লিভিং রুমে টি ভি চলছে।

সকাল ন'টা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত টি ভি খোলাই থাকে, তার সামনে বসে থাকে অনীশ। সে শুধু বিভিন্ন চ্যানেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খবর শোনে। অন্য কোনও প্রোগ্রামে তার আগ্রহ নেই।

এমনিতেই সংবাদ-চ্যানেলগুলিতে দারুণ একঘেয়েমি থাকে, একই খবর বলে যায় বার বার। এ দেশে সেই একঘেয়েমি আরও বেশি। বড় খবর না থাকলে ছোটখাটো খবরই ফলাও করে বলে। আর যাকে বলে ওয়ার্লড নিউজ, তা প্রায় হাসির ব্যাপার। আমেরিকার বাইরে ইরাক আর ইরান ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও দেশ নেই মনে হয়। সব কিছুই ওখানে ঘটছে। আর দু'একদিন অন্তর আফগানিস্তান। ব্যাস!

ইদানীং অবশ্য কদাচিৎ চিন আর ভারতের উল্লেখও থাকে। তাও বিরল সৌভাগ্যের ব্যাপার।

এই সব খবরে অনীশ কী রস পায় কে জানে।

অমিতা উঠে এসে অনীশের পেছনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ব্রেকফাস্টে কী খাবে?

অনীশ ঘাড় ঘুরিয়ে অমিতার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

সহজে উত্তর পাওয়া যাবে না, এটা জানেন অমিতা। তবু মনে থাকে না।

অমিতা আবার জিজ্ঞেস করলেন, আজ একটা ওমলেট খাবে? সঙ্গে টোস্ট আর কফি?

একই রকম নিস্পৃহ দৃষ্টি অনীশের। সে বোবা নয়। কিন্তু দিনের পর দিন তার ভাষা ক্রমশ কমে আসছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ একটা পুরো বাক্য বলে ফেলে।

এ বারেও কোনও উত্তর না পেয়ে অমিতা জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে দুধ-সিরিয়াল? মাথা নেড়ে হ্যাঁ কিংবা না বলো!

অবাধ্য বালকের মতন অনীশ মাথাও নাড়ল না।

অমিতা তার মাথায় একটা ছোট্ট চাঁটি মেরে বলল, তবে আমি যা দেব, তাই খেতে হবে। ও কে?

কিচেনে ফিরে এসে অমিতা কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। নিজের মুখে যখন চাইবে না, তখন আর ওমলেট বানাবার ঝামেলা করার কী দরকার। দুধ-সিরিয়ালই সহজ।

কফির জল চাপিয়ে দিয়ে অমিতা দুধ, সিরিয়াল দিয়ে এল অনীশকে। ও কোনও দিন কিচেনে কিংবা ডাইনিং টেবিলে বসে খায় না, সব খাবার ওকে টি ভি'র সামনেই দিতে হবে।

ফোন বেজে উঠল। অফিস থেকে অমলেশ।

তিনি অমিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার টেম্পারেচার এখন কত? থার্মোমিটার দিয়েছিলে?

নিজের কপালে হাত দিয়ে অমিতা বললেন, না, দিইনি। এখন জ্বর নেই মনে হয়।

অমলেশ মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, মনে হয় আবার কী? সারা দিনে অন্তত তিন বার টেম্পারেচার নিয়ে রেকর্ড রাখতে হবে। দ্যাট্‌স ডক্টর্স অরবোল্‌স অ্যাডভাইস, ইজ্‌ন্ট ইট? শুধু শুধু জ্বর হবে কেন?

আচ্ছা, আচ্ছা, নিচ্ছি, নিচ্ছি।

অনীশ ব্রেকফাস্ট খেয়েছে?

দিয়েছি। কতক্ষণে খাবে কে জানে।

কুহু এসে পৌঁছেছে?

না।

ও আজ আসছে কেন? অত সকালে ফোন করল! এ বার অমিতা উল্টে প্রশ্ন করলেন, কেন, মেয়ে এলে তুমি খুশি হও না!

অমলেশ বললেন, সে কথা হচ্ছে না। অফিস না গিয়ে হঠাৎ সপ্তাহের মাঝখানে।

আসুক, তখন জিজ্ঞেস করব।

এলে আমাকে জানিও। বাই।

সারা দিনে দু'তিনবার ফোনে এই ধরনের সাধারণ কথাবার্তা হয়। আর একটু পরে অমলেশ জানতে চাইবেন, দুপুরে কী লাঞ্চ খাওয়া হবে।

এ বারে অমিতা নিজেই মেয়েকে ফোন করলেন।

কুহু সঙ্গে সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, মা। বলো। এই তো আসছি।

তুই এখন কোথায়?

টাপাঞ্জি ব্রিজ ক্রশ করছি।

ওরে বাবা, সে তো অনেক দূর। পৌঁছোতে অনেক দেরি হবে।

বেরুতে বেরুতে দেরি হয়ে গেল। ছেলেমেয়ে দুটোকে তৈরি করতে হল যে। বাঁদররা কি আর সহজে চান করতে চায়!

ওরাও আসছে? তা হলে প্রদীপ একা থাকবে? ওকেও আসতে বললে পারতিস।

প্রদীপ তো কাল সন্ধেবেলা সানফ্রান্সিসকো চলে গেছে অফিসের কাজে। এই উইক এন্ডে ফিরবে না।

ঠিক আছে। সাবধানে চালা। তোদের তো আসতে আসতে দুপুর হয়ে যাবে। ভাত রান্না করে রাখব?

ভাত? আমি ভাত খাব। আর তুমি যে দেশ থেকে সোনামুগ ডাল এনেছিলে, তা এখনও আছে? আই লাভ মুং ডাল। কিন্তু এরা তো ভাত খেতে চায় না। হ্যামবার্গার ছাড়া মুখে কিছুই রোচে না। তোমার কাছে আছে নাকি?

ও সব জাঙ্ক ফুড আমি রাখি না। ওদেরই বা ও সব খাওয়াস কেন? বড় হয়েছে, এখন রোজ ইন্ডিয়ান খাবার না খেতে চায় স্যান্ডুইচ খাওয়ানো অভ্যেস করা।

মা, বাচ্চারা তো ওই সব জাঙ্ক ফুড খাবেই। ওই জন্যই ম্যাকডোনাল্ডের অত বড় ব্যবসাটা চলছে। আমাদের মতন বয়েসে এলে ওরা নিজেরাই বুঝবে। রাস্তা থেকে কয়েকটা হট ডগ আর হ্যামবার্গার তুলে নেব?

সেই ভাল। তবু তোর থামা হবে একবার। আইসক্রিম আনিস না। বাড়িতে একগাদা আইসক্রিম জমে আছে।

ফোন ছেড়ে দিয়ে অমিতা একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন।

কুহু ভালই গাড়ি চালায়। এ দেশটাতেই গাড়ি-সর্বস্ব জীবন। বাড়িতে দুধ ফুরিয়ে গেলেও গাড়ি নিয়ে দোকানে যেতে হয়। তবু কেউ দুর থেকে আসছে জানলেই দুশ্চিন্তা ঝিলিক মারে মনের মধ্যে। দুর্ঘটনাও তো হয়। এই পরিবারেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য সেই ঘটনার স্মৃতি-কাতর হয়ে রইলেন অমিতা।

জল গরম হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। অমিতা এক কাপ ইনস্ট্যান্ট কফি বানিয়ে ফেললেন। তিনি নিজে পছন্দ করেন চা।

কফির কাপটা অনীশকে দিতে গিয়ে দেখলেন, এতক্ষণে সে দুধ-কর্নফ্লেক্স অর্ধেকও খায়নি। এই জন্যই তার দুধটা গরম করার দরকার হয় না। ঠান্ডা তো করবেই।

অনীশ মন দিয়ে আবহাওয়ার খবর দেখছে। অমিতাও দাঁড়িয়ে দেখলেন একটুক্ষণ। আজ সন্ধের পর বস্টন এলাকায় ঝড়-বৃষ্টি হবে। এখন জানলার বাইরের আকাশ ঝকঝকে নীল। দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না ঝড়-বৃষ্টির কথা। তবু হবে ঠিকই। এদের ফোরকাস্ট টায় টায় মিলে যায়।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই দাড়ি কামিয়ে প্যান্ট-শার্ট পরে নেয় অনীশ। প্রতিদিন নতুন কাচা শার্ট। যেন সে অফিস যাবার জন্য তৈরি। যদিও অফিস যাওয়া তার ঘুচে গেছে অনেক দিন। সারা দিন এই পোশাকে বসে থাকবে, পারতপক্ষে ওঠে না, কোনও কাজও করে না। শুধু খাওয়ার পর নিজের কাপ-প্লেট ধুয়ে দেয়। সেটা বহু দিনের অভ্যেস।

একটা মানুষ সারা দিন বাড়িতে বসে থাকবে, অথচ কোনও কথা বলবে না, এটা এক এক সময় অসহ্য লাগে অমিতার। কথা বলাবার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, কোনও লাভ হয়নি। এক সময় কত মজার মজার গল্প করত অনীশ।

কফির কাপটা রেখেই একটু বাদে আবার ফিরে এলেন অমিতা। বললেন, এ বারে ওষুধ খেতে হবে। হাঁ কর।

হাঁ করল অনীশ, মুখের মধ্যে ওষুধগুলো নিয়ে কফিতে চুমুক দিয়ে গিলে ফেলল।

অমিতা জিজ্ঞেস করলেন, আজ নতুন খবর কী আছে? ইরাকে গাড়ি-বোমায় আর ক'জন মারা গেল।

মুখটা নিচু করল অনীশ। অর্থাৎ সে কোনও উত্তর দেবে না।

কখনও কখনও কিছু একটা বলে। যেমন, কালকেই দুপুরে তার মুখ দিয়ে কিছু শব্দ বেরুতেই অমিতা কাছে এসে ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী বললে? আমায় কিছু বললে?

অনীশ স্পষ্ট ভাবে বলেছিল, হি ইজ মেন্টালি সিক। আ সিক ম্যান ইজ দা প্রেসিডেন্ট অব দিস কান্ট্রি। দুর্ভগ্যজনক।

একেবারে স্বাভাবিক মানুষের মতন কথা। তবে ওই পর্যন্তই, আর কিছু না।

রান্নার জায়গায় ফিরে এসে অমিতা কাবার্ডে সোনামুগ ডাল খুঁজতে লাগলেন। ফুরিয়ে গেছে কি না কে জানে।

কালকের অনেক ভাত আছে। একটা আলু-কপির তরকারি আর স্যামন মাছ। প্রচুর লেফ্‌ট ওভার। গরম করে নিলেই হবে। কুহু ডাল পেলেই খুশি। আর অনীশকে তো যা দেওয়া হবে, তাই-ই খাবে। নুন বেশি হোক, কিংবা ঝাল বেশি হোক, তবু মুখে কোনও রা নেই।

হঠাৎ খুব জোরে জোরে ঝিঁঝি ডাকছে। এগুলো ঠিক দেশের মতন ঝিঁঝি নয়, বড় বড় পোকা, এ দেশে বলে সিকাডা। কেন এক এক সময় ওদের তেজ বেড়ে যায়, তা কেউ জানে না।

এ বাড়ির বাগানটা ছোট হলেও বড় বড় গাছ দিয়ে ঘেরা। পাশের বাড়িটা দেখাই যায় না। এক পাশে আমেরিকান, অন্য পাশে এক গ্রিক দম্পতির বাড়ি। প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাইরে দেখা হলে দু'চারটে ভদ্রতার কথাবার্তা হয়। কোনও সামাজিক সম্পর্ক নেই। কেউ কারওকে বাড়ির ভেতরে ডাকে না।

একটা লাল রঙের কার্ডিনাল পাখি মাঝে মাঝে এসে বসে ডেকটায়। প্রায় এই সময়েই। আজ পাখিটাকে দেখা যাচ্ছে না।

এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই ফুরুৎ ফুরুৎ করে এক সঙ্গে দুটো কার্ডিনাল পাখি এসে বসল বেশ কাছে। অমিতা রীতিমতন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এর আগে আর কোনও দিন এই পাখি একসঙ্গে দুটো দেখা যায়নি। পাখিরা এক জোড়া হলেই দেখতে বেশি ভাল লাগে। যেন অল্পবয়েসি স্বামী-স্ত্রী বেড়াতে বেরিয়েছে।

অল্পবয়েসি কেন মনে হল? পাখিদের কেউ কি বুড়ো হতে দেখেছে?

চন্দননগরের বাড়িতে অমিতার মায়ের একটা পোষা টিয়া পাখি ছিল। খাঁচার দরজা খোলা রাখলেও সেটা উড়ে পালাত না। কখনও খাঁচা থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে হাঁটত কয়েক পা, আবার নিজেই ঢুকে পড়ত খাঁচায়। সবাই বলত, পাখিটা বুড়ো হয়েছে, ওড়াও ভুলে গেছে।

মা বলতেন, খাঁচার মধ্যে থাকার চেয়ে বাইরের আকাশে ওড়াউড়ি করা যে বেশি ভাল, তা কি পাখিরা বোঝে? খাঁচার মধ্যেই তো নিশ্চিন্তে খাবার পায়, আর যদি কেউ খোঁচাখুঁচি না করে, তা হলে বাইরে যাবে কেন? অনেকটা হিন্দুবাড়ির মেয়েদের মতন, তারা নিজেরাই স্বাধীনতা চায় না।

মা একটা স্কুলের হেড মিস্ট্রেস ছিলেন। নারী-স্বাধীনতা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন 'বসুমতী' নামে একটা পত্রিকায়। অমিতার মনে আছে, তার বিয়ের পর মা চুপি চুপি বলেছিলেন, তোকে যে শাঁখা আর লোহা পরিয়ে দিয়েছে, বিদেশে গিয়ে ওগুলো খুলে ফেলিস। ওগুলোর কোনও দরকার নেই।

এ দেশে আর শাঁখা, নোয়া কে পরে? তবে শাঁখাটা বাদ দিলেও অনেকে নোয়াটা রেখে দেয়, সোনায় মুড়ে। মনে হয়, সোনার রুলি। সংস্কার সহজে যায় না। দেশে অনেক মেয়ের এখনও ধারণা, স্বামীর মঙ্গলের জন্য এই নোয়া বা লোহা ধারণ করতে হয়, এটা খুলে ফেলা বৈধব্যের চিহ্ন। আসলে তো ওটা স্বামীর সেবাদাসী হয়ে থাকার প্রতীক।

অমিতা মায়ের কথাই মেনে নিয়েছিলেন। কুহুর বিয়ের সময় এ সব প্রশ্ন ওঠেইনি, যদিও এখানেই বিয়েটা হয়েছিল বাঙালি মতে। তবে একবার দেশে বেড়াতে গিয়ে কুহু এক জোড়া রুপো বাঁধানো শাঁখা কিনে এনেছে শখ করে। পরেওছে দু'একটা পার্টিতে। সেটাকে ঠিক হিন্দু বিয়ের শাঁখা বলা যায় না, এক ধরনের কস্টিউম জুয়েলারি। মাঝে মাঝে এথ্‌নিক গয়না পরার ফ্যাশান চালু হয়।

চন্দননগরের সেই বাড়িটা আর নেই। অমিতার ছোট ভাই রঞ্জন সে বাড়ি বিক্রি করে কলকাতার সল্টলেকে একটা ফ্ল্যাট কিনেছে। তবু অমিতার এখনও দেশের কথা মনে পড়লেই চন্দননগরের সেই বাড়িটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

একতলার বারান্দার সামনেই ছিল দুটো ঝাউ গাছ। ছাদ থেকে দেখা যেত গঙ্গা। সেই ছাদে কিশোরী অমিতা প্রতিদিন সন্ধেবেলা পড়তে বসার আগে স্কিপিং করত একশো বার। একবার দড়িটা পায়ে জড়িয়ে গিয়ে খুব জোরে আছাড় খেয়েছিল। বাঁ হাঁটুতে লেগেছিল প্রচণ্ড, চোখে জল এসে গিয়েছিল ব্যথায়, কিন্তু আর কারওকে জানাবে না বলে তখুনি নীচে যায়নি, কেঁদেছিল একা বসে বসে।

কত কাল আগেকার কথা। তবু বাঁ হাঁটুতে এখনও মাঝে মাঝে চিনচিনে ব্যথা হয়। সেই ব্যথাটা ভাল লাগে অমিতার। সেই ব্যথা তার কৈশোর-স্মৃতি ফিরিয়ে আনে।

ওই চন্দননগরের বাড়িতেই অমিতার প্রথম প্রেম। অবশ্য এ দেশের মতন চুমোচুমি-জড়াজড়ি কিছুই হয়নি, তবু বিশুদ্ধ প্রেম তো অবশ্যই।

মামাতো ভাইয়ের বন্ধু সত্রাজিৎ। পড়াশুনোয় দারুণ ভাল। বাড়িতেই আসত, অনেকের মধ্যেই দেখা হত, হইচই করে ক্যারাম খেলা হত। আরও তো ছেলেরা আসত, তবু কী করে যেন একসময় শুধু সত্রাজিতের সঙ্গেই চোখে চোখে কথা শুরু হল। তার পর গোপনে চিঠি বিনিময়। সে সব চিঠিতে একটাও প্রেমের কথা থাকত না, শুধু কবিতা পড়ার কথা। অমিতা তখন সতেরো আর সত্রাজিৎ বাইশ। একবার শুধু দেখা হয়েছিল। গঙ্গার ধারে নিরিবিলিতে, তাও আগে থেকে ঠিক করা কিছু নয়, হঠাৎ-ই, দু'জনে পাশাপাশি হাঁটা, অমিতার বুক টিপ টিপ করছিল, বার বার বলছিল, এ বার আমি যাই, এ বার আমি যাই! আর সত্রাজিৎ বলছিল, আর একটু থাকো, আর একটু থাকো!

পরের বছর অসমের ডিগবয়ে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে সে ফিরল প্রবল জ্বর নিয়ে। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। মাত্র চার দিনের মধ্যেই খরচ হয়ে গেল তার সব নিঃশ্বাস।

সত্রাজিৎ বেঁচে থাকলে খুব সম্ভবত তার সঙ্গেই বিয়ে হত অমিতার। এটা মোটামুটি ঠিকই হয়ে গিয়েছিল। সত্রাজিৎ-এর সঙ্গে বিয়ে হলে অমিতার জীবনটা কোন দিকে প্রবাহিত হত কে জানে। কুহুর বদলে তার অন্য ছেলেমেয়ে হত! ভাবাই যায় না। এই জীবন নিয়ে অমিতার কোনও খেদ নেই। সত্রাজিতের তুলনায় অমলেশ কোনও অংশে অযোগ্য নয়। বাচ্চা বয়েসে ও রকম একটু আধটু রোমান্স হয়েই থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন না, বাল্য প্রেমে সুখ নাই! বিয়েটিয়ে হওয়ার চেয়ে মধুর স্মৃতি

হয়ে থাকাই ভাল।

এত দিন পরেও মাঝে মাঝে মনে পড়ে সত্রাজিতের কথা। একটুও অস্পষ্ট হয়ে যায়নি, তার মুখটা জ্বলজ্বল করে। খুব হাসির সময় সে দু'দিকে মাথা দোলাত। গাঢ়, জোরা ভুরু ছিল সত্রাজিতের।

এই সেপ্টেম্বরে অমিতার ষাট বছর বয়েস হবে। একটা বড় পার্টি হবে। বলে রেখেছে কুহু।

মৃত ব্যক্তিদের বয়েস বাড়ে না। অমিতার সেই প্রথম প্রেমিকের বয়েস আজও বাইশ।

॥ ২ ॥

মধ্যরাত্রির কথোপকথন

ঠিক সওয়া দুটোর সময় কুহুর হন্ডা গাড়িটা এসে থামল বাড়ির সামনে।

অমিতা উৎকর্ণ হয়েই ছিলেন, দৃষ্টিও চলে যাচ্ছিল বার বার বাইরে, সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেয়ে দরজা খুলে দাঁড়ালেন।

কুহু পরে আছে একটা টাইট জিন, থ্রি কোয়ার্টার, হাঁটুর নীচ পর্যন্ত, তলার দিকটা দেখলে মনে হবে ছেঁড়া ছেঁড়া, সুতো ঝুলছে, এটাই ফ্যাশনেব্‌ল। সাদা রঙের টপ, কলারের রং নীল।

কুহুর বয়েস হবে পঁয়তিরিশ-ছত্রিশ। কিন্তু এরই মধ্যে তার মাথার চুলে একটু একটু সাদা ছোপ লেগেছে। কুহু রং টং করে না। সে তেমন একটা কিছু আহামরি সুন্দরী নয়। তবে তার সর্বাঙ্গে ঝলমল করে স্বাস্থ্যের দীপ্তি। এক সময়ে সে খুব ডায়েটিং করে স্লিম হবার চেষ্টা করেছিল, তাতে তেমন সুবিধে হয়নি। অবশ্য মেদ নেই তার, পাঁচ চার উচ্চতা, কোমরের কাছটা মসৃণ, স্তন দুটি উদ্ধত, নিয়মিত জিমে যায়, তার শরীরের গড়নটাই ভরাট ধরনের।

গাড়ি থেকে নেমে সে হাসিমুখে একবার মায়ের দিকে তাকিয়ে পেছনের দরজা খুলে ছেলে আর মেয়েকে নামাল।

ওরা যমজ। বয়েস এগারো পেরিয়ে গেছে।

গর্ভাধানের কয়েক মাসের মধ্যেই বোঝা গিয়েছিল যে কুহুর যমজ সন্তান হবে। তবে দুটিই ছেলে কিংবা দুটিই মেয়ে, তা ডাক্তাররা জানাননি। কুহু ঠিক করে রেখেছিল, দুটিই পুত্র হলে নাম রাখা হবে রবি আর সোম, কন্যা হলে নাম ঠিক করা ছিল, রুমা আর ঝুমা।

হল, ছেলে আর মেয়ে। চেহারাতেও কোনও মিল নেই। নাম রাখা হল, রবি আর চন্দ্রা। ওদের বাবা প্রদীপ বলে, সান অ্যান্ড মুন।

ভাইবোনের প্রচণ্ড খুনসুটি মাঝে মাঝে মারামারি পর্যায়ে চলে যায়। গাড়িতে যাবার সময় দু'জনেই বসতে চায় মায়ের পাশে। ঠেলাঠেলি করে উঠে পড়ে দু'জনেই।

কুহু দু'জনকেই নামিয়ে দেয়। এয়ার ব্যাগ আছে বলে ফ্রন্ট সিটে বাচ্চাদের বসাটা বিপজ্জনক। বারো বছর বয়েসের আগে তো নয়ই। পেছনের সিটে বসিয়েও কুহু ওদের সিট বেল্ট বাঁধতে বাধ্য করে।

গাড়ি থেকে নেমেই দু'জনে ছুটল, কে আগে পৌঁছবে। দু'জনে প্রায় একসঙ্গেই জড়িয়ে ধরল অমিতাকে।

ওরা অমিতাকে মাঝে মাঝে ডাকে গ্র্যানি, মাঝে মাঝে দিদু। আর অমলেশকে গ্র্যান্ডপা ডাকলেই তিনি মাথা নেড়ে বলবেন, উঁহু, উঁহু, তাই তিনি শুধু ডাড়ু।

দুটো বড় বড় ব্যাগ দু'হাতে নিয়ে ভেতরে এল কুহু।

অমিতাকে জিজ্ঞেস করল, মা, তুমি খেয়ে নিয়েছ তো। এত ট্রাফিক ছিল রাস্তায়।

অমিতা দু'দিকে মাথা নাড়লেন। মেয়ে এসে একসঙ্গে খাবে বলেছে, যতই দেরি হোক, তার আগে কোনও মা খেয়ে নিতে পারে?

কুহু বলল, আই ফ্যাম স্টারভিং। দেরি হচ্ছিল বলে ছেলে-মেয়ে দুটোকে রাস্তায় খাইয়ে এনেছি। তুমি বসো, আমি খাবারগুলো গরম করে ফেলছি।

অনীশকে আগেই খাবার দিয়েছেন অমিতা। সে এখনও অর্ধেকও খায়নি।

ব্যাগ দুটো নিয়ে ওপরে উঠে গেল কুহু। একটু পরেই নেমে এল দুদ্দাড় করে।

লিভিং রুমে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, হাউ আর ইউ টুডে, কাকামণি?

অনীশ মুখ তুলে দেখল কুহুকে। তার পর একবার মাথা নাড়ল নিঃশব্দে।

সেটাই একটা উত্তর। ঠিক বুঝে নিয়ে কুহু বলল, গুড! ইউ লুক মাচ বেটার দ্যান বিফোর। ওষুধটষুধ সব খাচ্ছ তো?

আবার মাথা নাড়ল অনীশ।

কুহু অনীশের থুতনিটা ধরে হাসতে হাসতে বলল, আমি, ওয়ান অফ দিজ ডেইজ, তোমাকে কথা বলাবই বলাব। ভেবেছ কী?

তার পর ছেলেমেয়েকে ডেকে বলল, রবি, চন্দ্রা, এই দাদুটাকে প্রণাম করেছ? এ দিকে এসো।

ছেলে আর মেয়ে দু'জনেই সব বাংলা কথা বোঝে। কিন্তু মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে চায় না। তারা অমিতার কাছে আদর খাচ্ছিল, লিভিং রুমে এসে প্রণাম করল অনীশের পায়ে হাত দিয়ে।

অনীশ একটা হাতও তুলল না।

এই অবহেলা ছোটরা ভালই বোঝে। তাই তারা অনীশের কাছাকাছি কখনও স্বেচ্ছায় আসে না।

অমিতা মাইক্রোওয়েভে ভাতের পাত্রটা গরম করতে দিয়েছেন। কুহু [illegible] ফ্রিজ খুলে বার করল অন্যান্য খাবার। ডালের বাটিটা নিয়ে গন্ধ শুঁকে বলল, আঃ লাভলি!

অমিতা বললেন, তোর স্বভাবটা তোর বাবার মতন। তোর বাবাও ডাল খেতে খুব ভালবাসে। সব খাওয়া হয়ে গেলেও শেষ পাতে একটু ডাল চটকে দিয়ে খাবে। বাঙালরা এই রকম করে।

কুহু বলল, নিউ জার্সিতে আমাদের একজন খুব ভাল বন্ধু আছে। ডক্টর [illegible] আহমেদ, বাংলাদেশের লোক। ওঁর স্ত্রী আমিনা। ও বাড়িতে তিন-চার রকম ডাল রান্না হয়। গত সপ্তাহে খেলাম আম-ডাল। কাঁচা আম কোথা থেকে জোগাড় করল কে জানে।

অমিতা বললেন, বাংলাদেশি দোকানে পাওয়া যায় বোধহয়। এখানেও আছে, অনেক দূর বলে আমাদের যাওয়া হয় না।

কুহু বলল, এখন তো জ্যাকশন হাইটে টাটকা মোচা আর পটলও পাওয়া যায়। আমি অবশ্য মোচা কুটতে ফুটতে জানি না। তুমি জান?

অমিতা বললেন, নাঃ! শিখিনি কখনও। ও সব আমি দেশে গিয়েই খাই। তবে আমার মায়ের হাতের মোচা-চিংড়ি রান্নার স্বাদ এখন আর পাই না।

কুহু বলল, যাই বলো আর তাই বলো, এ দেশে তো হাজার রকম চিংড়ি পাওয়া যায়। কিন্তু দেশের চিংড়িই সবচেয়ে টেস্টি।

অমিতা বললেন, বি বি সিতে একদিন বলছিল, বে অব বেঙ্গলের চিংড়ি সবচেয়ে গুড কোয়ালিটির হয়। তবে জাপানটাপানেই এক্সপোর্ট হয় বেশি, এ দেশে আসে না। এখানকার লবস্টারও।

হঠাৎ থেমে গিয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন অমিতা।

দ্রুতহাতে সব খাবার গরম করে, প্লেট সাজিয়ে ফেলল কুহু।

রবি আর চন্দ্রা দৌড়ে দৌড়ে একবার সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, আবার নামছে, তাদের ধমক দিয়ে কুহু বলল, এই তোরা বেসমেন্টে যা, সেখানে খেলার অনেক জিনিস পাবি। এখানে আমাদের বিরক্ত করবি না। খবর্দার ঘুমোবি না কিন্তু। ছোটদের দুপুরে ঘুম আমি একেবারেই পছন্দ করি না।

ডাল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে কুহু মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল, তোমার দেওরটির কিছু ইমপ্রুভমেন্ট হল? নাকি একই রকম?

অমিতা বললেন, ইমপ্রুভমেন্ট তো কিছু দেখছি না। অত ওষুধ খায়, তাতেও কিছু কাজ হচ্ছে কি না কে জানে। ডাক্তারের সঙ্গে আর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে।

এমন একটা গুণী মানুষ, অথচ পাগলের মতন সব কিছু ভুলে মেরে দিয়েছে, কিছুতেই সহ্য করা যায় না।

পাগল বলিস না। পাগল তো নয়। সব কথা বোঝে, সব কথা শোনে। এই যে টি ভি'র সামনে বসে থাকে, অথচ আমি যদি কখনও বলি, অনীশ কিছুক্ষণের জন্য টি ভিটা বন্ধ রাখো তো, অমনি উঠে বন্ধ করে দেবে।

বাড়িতে বেশি লোকজন এলে উনি কী করেন?

উঠে চলে যায় নিজের ঘরে। সে ঘরেও একটা ছোট টি ভি আছে।

আসলে কিন্তু কাকামণি টি ভি'র দিকে তাকিয়ে থাকলেও কিছু দেখে না। যেমন বই পড়তে পারে না। তেমনই টি ভি'র প্রোগ্রামও ফলো করতে পারে না। সম্ভব নয়। দারুণ একটা ট্রমা, তার পর ডিপ ডিপ্রেশান।

কুহু, তুই হঠাৎ আজ কেন এলি রে?

কথা থামিয়ে হেসে ফেলল কুহু। সেটা দুষ্টুমির হাসি। একটু ঝুঁকে এসে বলল, আমি ভাবছিলাম, তুমি কতক্ষণে এটা জিজ্ঞেস করবে। অনেকক্ষণ ধরেই বলবে বলবে করছিলে, তাই না? কেন, মা, আমি কি যখন ইচ্ছে আসতে পারি না? এটা কি আর আমার বাড়ি নয়!

অমিতা যেন একটু লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, তোর বাড়ি হবে না কেন? সবই তো তোর! আজ বুধবার, অফিস খোলা। হঠাৎ ছুটি নিলি, তাই ভাবছিলাম

কুহু বলল, মাঝে মাঝে রুটিনের একঘেয়েমি ভাঙতে হয় মা। প্রত্যেক দিন কাজে যেতেই হবে?

ছেলেমেয়েদের ইস্কুল...

দেশের ছেলেমেয়েরা মাঝে মাঝে ইস্কুল কামাই করে না? এখানকার সব কিছুতেই কড়াকড়ি। দু'একদিন ইস্কুলের পড়া না করলেই কি সারা জীবন মূর্খ হয়ে থাকবে?

এ দেশে থাকতে গেলে তো এখানকার নিয়ম মানতেই হয়।

অনীশ উঠে এসে সিঙ্কে তার প্লেট ও কাঁটা-চামচ ধুচ্ছে।

কুহু বলল, তুমি রেখে দাও কাকামণি, আমি ধুয়ে দেব।

অনীশ কাজ না থামিয়ে একবার তাকাল কুহুর দিকে। এককালে সুপুরুষ ছিল সে, এখন মুখখানা একেবারে শুকনো।

খাওয়া শেষ করেই কয়েক মিনিটের মধ্যে রান্নাঘরটা পরিষ্কার করে ফেলল কুহু। তার পর সে বসে গেল কমপিউটারে।

অমিতাকেও তো কাজে যেতে হয়, তার জ্বর হয়েছে বলেই যে তিনি ছুটিতে আছেন, তা জানে কুহু। পরশু দিনই টেলিফোনে কথা হয়েছে। কিন্তু এখনও একবারও কুহু মায়ের শরীরের কথা জিজ্ঞেস করেনি।

খাওয়ার সময় মুখে স্বাদ পাননি অমিতা। জ্বরটা এখনও রয়ে গেছে, সকালে ছিল একশো এক।

দুপুরে ঘুমোবার অভ্যেস নেই, অমিতা মিলান কুন্দেরার জোক নামে অর্ধেক পড়া উপন্যাসটা খুলে বসলেন একটা সোফায়। এখন তিনি পর পর মিলান কুন্দেরার বইগুলো পড়ে যাচ্ছেন।

একবার ফোন বাজল। কুহুই ধরে কথা বলল কিছুক্ষণ। তার পর চেঁচিয়ে জানাল, মা, ধীমান কল করেছিল। ওদের আজ সন্ধেবেলা আসতে বলেছি। ভালই হবে, ওদের ছেলেমেয়ে দুটো রবি-চন্দ্রার সঙ্গে খেলবে।

অমিতা বললেন, আচ্ছা। ওদের খেয়ে যাবার কথা বলেছিস তো?

অমলেশ ফিরলেন সাড়ে পাঁচটায়। অন্য দিনের চেয়ে একটু আগে। অমিতা বইটা উল্টে রেখে চায়ের জল চাপালেন।

অমলেশ স্ত্রীর কপালে হাত দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, এখনও ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে। আর একবার থার্মোমিটার দিতে হবে।

কুহুর এসে পৌঁছবার খবর তিনি দুপুরেই টেলিফোনে জেনেছেন। অমিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, কুহু যে আজ হঠাৎ এল, কোনও বিশেষ কিছু দরকার পড়েছে? ওর ইনকাম ট্যাক্সের কাগজপত্র নিয়ে কী একটা গণ্ডগোল হয়েছিল না?

অমিতা বললেন, তুমি জিজ্ঞেস করো। আমায় তো সে রকম কিছু বলল না। আমায় বলল, এমনিই রুটিন ভাঙার ইচ্ছে হল।

অমলেশ বললেন, তা অবশ্য মন্দ নয়। আমাদের মতন বয়েস হয়ে গেলে রুটিন ভাঙা শক্ত, কিন্তু ওরা পারে।

তিনি কমপিউটারের ঘরে ঢুকতেই কুহু উঠে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরল। বাচ্চা মেয়ের মতন তাঁর প্রশস্ত বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলল, বাপি, তুমি কেমন আছ? মাঝখানে তোমার খুব কাশি হয়েছিল, এখন কমেছে?

বাবার কাশির কথা তার মনে আছে, মায়ের জ্বরের কথা মনে নেই।

অমলেশ বললেন, প্রদীপকে একা রেখে এলি? সে বুঝি রুটিন ভাঙতে পারে না।

কুহু বলল, সে তো অফিসের কাজে সানফ্রান্সিসকো গেছে। এই উইক এন্ডটা ওখানেই থাকবে।

তোর যে ইনকাম ট্যাক্সের কী একটা সমস্যা ছিল!

সে সব মিটে গেছে। ইন ফ্যাক্ট, আমি বেশ কিছু টাকা রিফান্ড পেয়েছি।

প্রদীপের ব্লাডসুগার কাউন্ট কত এখন?

প্রত্যেক দিন সকালে নিজে পরীক্ষা করে। নর্মাল, আন্ডার কন্ট্রোল। তবে ওষুধ খায়।

তোর কিছু হয়নি তো?

আমি! ফিট অ্যাজ আ ফিড্‌ল। বয়েস যে হচ্ছে তা বুঝতেই পারি না।

বয়েস! তোর আবার কী বয়েস? মিড থার্টিজ, মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। থার্টি ফাইভ টু ফিফটি ফাইভ, শরীর ও মন সব দিক থেকেই এনজয়েবল।

একটু বাদে অমলেশ অনীশের খোঁজ নেবার জন্য তার কাছে এসে দাঁড়ালেন। উত্তর পাবেন না জেনেও প্রশ্ন করলেন টুকিটাকি।

অনীশ অবশ্য তাঁকে মোটেই অগ্রাহ্য করে না। মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অসহায় ভাবে।

এর পর চায়ের কাপ হাতে নিয়ে অমলেশ নেমে গেলেন বেসমেন্টে। নাতি নাতনির সঙ্গে খেলা চলবে অনেকক্ষণ।

ধীমানরা এল সাড়ে সাতটার সময়।

অমিতা দু'বার মনে করিয়ে দিলেও কুহু এর মধ্যে পোশাকও বদলাল না। স্নানও করল না। কমপিউটারের সামনে সেঁটে রইল আঠার মতন।

ধীমানের বয়েস বছর বেয়াল্লিশ। সে কিছু দিন প্রদীপের সহপাঠী ছিল ব্লুমিংটন, ইন্ডিয়ানায়। আবার নিউ জার্সিতে কুহুদের বাড়ির খুব কাছেই জয়ন্তী-ধীমানরা ছিল একটা অ্যাপার্টমেন্টে, বছর দুয়েক, সেই থেকে ওদের সঙ্গে বেশ ভাব। এই দম্পতিরও দুটি ছেলেমেয়ে, অবশ্য যমজ নয়, বড় মেয়েটি চন্দ্রার বয়েসি।

ধীমান এনেছে একটা হোয়াইট ওয়াইনের বোতল আর জয়ন্তী একটা মস্ত বড় কেক।

আগন্তুকদের দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অনীশ।

ধীমান বলল, অনীশ আঙ্কল, আপনি বসুন না। টি ভি চললে আমাদের কোনও অসুবিধে নেই। আমরা তো ফ্যামিলি রুমে বসছি।

অনীশের এই অবস্থার কথা স্থানীয় বাঙালিরা সবাই জানে। সকলেরই সহানুভূতি আছে তার ওপর।

আট মাস আগের একটি রাত। ফিলাডেলফিয়া থেকে সপরিবারে ফিরছিল অনীশ, সে-ই গাড়ি চালাচ্ছিল। পেছনের সিটে তার স্ত্রী সীমা আর মেয়ে রুবেল, সামনে অনীশের পাশে জগদীন্দ্রবাবু, তিনি দেশ থেকে এসেছিলেন একটা কাজে, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষক। অ্যাকসিডেন্ট হল রাত সওয়া এগারোটায়, অনীশের জ্ঞান ফিরল দেড় দিন পর হাসপাতালের বিছানায়। পাশের খাটে জগদীন্দ্র ভট্টাচার্য, তাঁর বুকের তিনটে পাঁজর ভেঙেছে।

সীমা আর রুবেলের চিকিৎসার কোনও সুযোগই পাওয়া যায়নি।

অনীশ গাড়ি চালাচ্ছিল, তাই সে দায়ী করেছে নিজেকে। কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে অনীশের কোনও দোষই ছিল না, পেছন থেকে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারে একটা ট্রাক। তার ড্রাইভার একেবারে মাতাল ছিল, পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে, সে দোষ স্বীকারও করেছে। ম্যান শ্লটারের চার্জ আনা হয়েছে তার নামে।

কিন্তু অনীশ সেটা কিছুতেই বুঝছে না। গভীর অপরাধবোধ থেকে শুরু হয়েছে ডিপ্রেশান, এটা একটা রোগ, এই রোগ এখন এমন একটা চরম জায়গায় পৌঁছেছে যে যখন তখন সে অত্মহত্যার চেষ্টাও করতে পারে।

অমলেশের সহোদর নয় অনীশ, পিসতুতো ভাই, কিন্তু খুবই আপন সম্পর্ক। বয়েসে ছোট হলেও অনীশই এ দেশে এসেছে আগে, আর সে-ই উদ্যোগ নিয়ে অমলেশদের আনায়। এই ঘটনার পর অনীশকে আর তার হোয়াইট প্লেনসের ফ্ল্যাটে একা থাকতে দেওয়া যায় না। কে তার দেখাশুনো করবে?

অমলেশ তাকে নিজেদের বাড়িতে এনে রেখেছেন, সে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পরই। তা নিয়ে অমিতার সামান্যতম অভিযোগও নেই। কোনও ঝঞ্ঝাটই তো নেই মানুষটিকে নিয়ে। বরং সপ্তাহের মাঝখানের দিনগুলিতে সারা দিন তাকে একা রেখে যেতে হয় বলে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই যথেষ্ট উদ্বেগ থাকে। কিন্তু আর তো উপায়ও নেই কিছু।

কবে আবার অনীশ সুস্থ, স্বাভাবিক হয়ে উঠবে, এখন শুধু তার অপেক্ষা।

ধীমানের কথা শুনেও অনীশ দাঁড়াল না। মাথা নিচু করে উঠে গেল ওপরে।

ওয়াইনের বোতল খুলে ফেলেছে ধীমান। অমলেশ ওয়াইন পান করেন না, তাঁর পছন্দ স্কচ। প্রতি রাত্রে ঠিক দু'পেগ, তার পর ন'টার সময় ডিনার, দশটার সময় বিছানায়। এই তার প্রতিদিনের ধরা-বাঁধা রুটিন।

কাল সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যেই যেতে হবে কাজে, গাড়ি চালাতে হবে এক ঘণ্টা। অর্থাৎ ঘুম থেকে উঠতে হবে পৌনে ছ'টার মধ্যে, তার পর শিট, শেইভ অ্যান্ড শাওয়ার (মলত্যাগ, দাড়ি কামানো ও স্নান), দু'খানা টোস্ট ও এক কাপ কফি, মোজা-জুতো, টাইটা গলায় ঝোলানো (সেটা বাঁধা হবে কোনও রেড লাইটে গাড়িটা থামলে)।

স্বচ্ছে চুমুক দিতে দিতে মাঝে মাঝেই ঘড়ি দেখছেন অমলেশ।

যাকে তাকে যা খুশি সম্বোধন করতে কুহুর মুখে আটকায় না। সে ধীমানকে বলল, এই যে ভ্যাবাগঙ্গারামদাদা, হোয়াইট ওয়াইন ঠান্ডা না করেই খুলে ফেললে? ওর কোনও স্বাদ পাওয়া যাবে?

ধীমান আমতা আমতা করে বলল, গাড়িতে ঠান্ডায় ছিল, এখানেও তো গরম নেই।

কুহু তবু বলল, ফ্রিজে না রাখলে হোয়াইট ওয়াইনের ফ্লেভারটাই বেরোয় না। তার বদলে রেড ওয়াইন আনলে পারতে। রুম টেমপারেচারে দিব্যি খাওয়া যায়। আমি রেড ওয়াইনই পছন্দ করি।

অমিতা বললেন, ও রকম কথা বলছিস কেন কুহু? আমার তো এই ওয়াইনটা দিব্যি লাগছে। তুই রেড ওয়াইন খেতে চাস, দ্যাখ না সেলারে কত রকম ওয়াইন আছে। তোর বাবা গত মাসে ফ্রান্সে গিয়েছিলেন, চার বোতল ওয়াইন এনেছেন। আসল বোর্দো।

কুহু হেসে বলল, আসল আর নকল কী? এ দেশে যা ফ্রেঞ্চ ওয়াইন পাওয়া যায়, তা কি নকল নাকি? আর ওয়াইন তো তরি-তরকারি নয় যে ফ্রেশ খেতে হবে!

ধীমান বলল, ফ্রেঞ্চ ওয়াইনের আর সে গৌরবের দিন নেই মাসিমা। এখন অস্ট্রেলিয়াও দারুণ ওয়াইন বানাচ্ছে।

কুহু বলল, ব্রেজিলিয়ান ওয়াইনও যথেষ্ট ভাল। বডি আছে।

জয়ন্তী বলল, এ দেশের বেশির ভাগ রেস্তোরাঁতেই তো অস্ট্রেলিয়ান সিরাজ খুব চলে।

অমলেশ মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, সিরাজ ভাল ওয়াইন। কয়েক বার চেখে দেখেছি। অস্ট্রেলিয়ানরা মদের নাম রেখেছে সিরাজ, অদ্ভুত না?

ধীমান বলল, আমি ইটালির একটা ছোট শহরে, পিসা'র খুব কাছে, একটা ওয়াইন পেয়েছিলাম, সেটার নাম দেখে চমকে উঠেছিলাম। 'অন্নপূর্ণা'! লোকাল ওয়াইন, কিন্তু গুড কোয়ালিটি। বোধহয় ওখানকার একটা টিম নেপালের দিক থেকে মাউন্ট অন্নপূর্ণা ক্লাইম্ব করতে গিয়েছিল।

কুহু বলল, এ বছর ক্যালিফোর্নিয়াতেও খুব ভাল আঙুর হয়েছে। এ বারের ওয়াইনও ভাল হবে। আমি ক্যালিফোর্নিয়ার রোজে খুব পছন্দ করি।

ওয়াইন বিষয়ে এ রকম আলোচনা কিছুক্ষণ চলে। এটাই কেতা। তুমি শুধু ওয়াইন খেয়ে গেলে, আর ওয়াইন বিষয়ে কোনও জ্ঞানের পরিচয় দিলে না, তা হলে বুঝতে হবে, তুমি যথেষ্ট সংস্কৃতিমান নও।

তলা থেকে রেড ওয়াইনের বোতল এনে কুহু বসল তার বাবার পাশে।

তার পোশাক হ্রস্ব, স্তনের স্বাস্থ্য যেন কিছুটা উপচে বাইরে আসতে চায়। কোনও বাবার পক্ষে নিজের যুবতী কন্যার বুক দর্শন করতে নেই, তাই অমলেশ মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে রইলেন।

অমিতা ঠিক লক্ষ করেছেন ব্যাপারটা। কিন্তু এই বয়েসের ছেলে বা মেয়ের পোশাক-আসাক নিয়ে কোনও রকম মন্তব্য করা চলে না। এ দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা।

ডিপ ফ্রিজারে অনেক রকম মাংস ও তরিতরকারি মজুত করা আছে, কিন্তু আজ আর এত লোকের জন্য রান্নার উৎসাহ পেলেন না অমিতা। কাছেই একটা থাই রেস্তোরাঁ আছে, টেলিফোনে কিছু খাবারের অর্ডার আর ক্রেডিট কার্ডের নম্বর বলে দিলে একেবারে দরজায় এসে সব পৌঁছে দিয়ে যাবে।

ঠিক ন'টার সময় খেতে বসা হল। সবাই একসঙ্গে। শুধু অনীশের জন্য সব খাবার প্লেটে সাজিয়ে ওপরে পৌঁছে দিয়ে এলেন অমিতা।

খেতে বসে ছেলেমেয়েদের বাংলা জ্ঞান নিয়ে কথা শুরু হল।

দুই পরিবারের বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে একটি অক্ষরও বাংলা উচ্চারণ করে না, বাবা-মায়ের সঙ্গেও বলে না। যদিও চার জনই বাংলা কথা বোঝে।

কুহুর ছেলেমেয়েদের মধ্যে চন্দ্রা বাংলা পড়তেও পারে, তবে বছর খানেক ধরে আর বাংলা বই ছোঁয় না। রবি প্রথম থেকেই বাংলা শিখতে অস্বীকার করেছে, বাংলা গান শুনলেও নাক কুঁচকোয়।

জয়ন্তী অভিযোগ করল স্বামীর নামে। আমি তো ছেলেমেয়েদের বাংলা শেখাবার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু ওদের বাবা সব সময় ওদের সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলে, তাই ওরা ভাবে বাংলার কোনও দরকার নেই।

ধীমান বলল, আমি আর সময় পাই কতটা? তা ছাড়া এখন ইংরিজিটাই ভাল করে শিখুক, এ দেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কমপিট করতে হবে তো! বড় হয়ে না হয় বাংলা শিখে নেবে।

জয়ন্তী বলল, আর শিখেছে!

অমলেশ বলল, নাঃ, আর শিখবে না। সেকেন্ড জেনারেশান, এটাই ওদের দেশ। ইন্ডিয়া ওদের কাছে বিদেশ, সেখানকার একটা ভাষা শিখে ওদের লাভ কী? বরং স্প্যানিশ বা ফ্রেঞ্চ শিখলে কাজে দেবে।

ধীমান বলল, অনেক বাবা-মা নিজেদের নস্টালজিয়া থেকে ছেলেমেয়েদের ওপর নিজেদের ভাষাটা চাপাতে চায়। এ দেশে তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছর থেকেও কেউ কেউ যে বাংলা বাংলা বলে লাফায়, আমার সেটা ভালগার মনে হয়।

জয়ন্তী বলল, একটা মজার জিনিস শুনবেন। আমার ছেলে তো বাংলা বলতেই চায় না। কিন্তু ও যখন ছোট ছিল, তখন আমি একটা ছড়া ওকে একটু সুর করে শোনাতাম। সেই ছড়াটা কিন্তু ও এখনও ঠিকঠাক মনে রেখেছে। রণ এক বার ছড়াটা শুনিয়ে দে তো।

রণ দু'তিন বার মাথা নেড়ে আপত্তি জানালেও শেষ পর্যন্ত মায়ের পীড়াপীড়িতে মুখ খুলতেই হল তাকে।

রণের উচ্চারণে ছড়াটি এ রকম :

ফান্ডেটে পড়িয়া বগা কান্ডে রে
ওরে ফান্ডেটে পড়িয়া বগা কান্ডে রে ...
ওড়িয়া যায় রে সকোয়ার পন্‌সি
বগীরে কয় ধ্ধারে
টোমার বগা বন্ডি হইসে
কালা নডির চারে রে ইত্যাদি

বাবা মায়েরা হেসে আকুল। চন্দ্রা বলল, হেই রণ, নট পন্‌সি, বাট পংখী, পংখী। নট নডি, বাট নদী।

ধীমান বলল, এখানকার বেঙ্গলি কমিউনিটির মধ্যে বাংলা জ্ঞানে কুহুই চাম্পিয়ান। এক বার একটা ফাংশানে একটা পোয়েট্রি রিসাইট করল, মাইকেল মধুসূদন ডাটের, মাই গড, কত সব ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডস, কুহুকে একটা প্রাইজ দেওয়া উচিত ছিল।

অমিতা বললেন, কুহু তো দশ বছর বয়েসে এ দেশে এসেছে। তার আগে বাংলা শিখে এসেছে ভাল করে।

কুহু বলল, পাঠভবন স্কুলে পড়েছি।

ধীমান বলল, সেই রেসিটেশানটা আর এক বার শোনাবে?

কুহু বলল, খেতে বসে কবিতা? রক্ষে কর! তা ছাড়া তুমি তো মানে বুঝবে না!

পার্টি শেষ হল দশটা দশে। ছেলেমেয়েদের চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু। অমলেশেরও চোখ টেনে আছে। ধীমানরা গেটের বাইরে যেতে না যেতেই তিনি ওপরে উঠে গেলেন।

মাকে কিছুতেই এঁটো বাসনপত্র তুলতে দিল না কুহু। সে খুব তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে ফেলল। সবই ডিশ্ ওয়াশারে ঢুকিয়ে দিতে হবে। বাচ্চাদের খেতে দেওয়া হয়েছিল পেপার প্লেটে, সেগুলো ফেলে দেওয়া হল গারবেজ ক্যানে।

তার পর সে মাকে বলল, তুমি শুতে যাও। আমি আরও মিনিট পনেরো কমপিউটারে বসব।

ওপর তলায় চারটে ঘর। কুহুর নিজস্ব ঘরখানা একই রকম রাখা আছে। পাশের ঘরে দুটো খাট ছেলেমেয়ের জন্য। মাস্টার বেড রুমটি ডান দিকের কোণে। আর যে-ঘরটি ছিল অমিতার স্টাডি, সেটা এখন অনীশের, একটা কিং সাইজের বিছানা পাতা হয়েছে।

শাড়ি ছেড়ে রাত পোশাক পরে নিলেন অমিতা। বাথরুম সেরে মুখে দু'রকম ক্রিম ঘষলেন কিছুক্ষণ ধরে। অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে রইলেন বাইরের অন্ধকারে অস্পষ্ট গাছপালার দিকে। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

অমলেশ অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, অল্প অল্প নাক ডাকছে। অমিতার চোখে ঘুমের চিহ্নমাত্র নেই। এমনিতেই তাঁর ঘুম কম। একটা টেবল ল্যাম্প জ্বেলে তিনি বইটা আবার পড়তে শুরু করলেন।
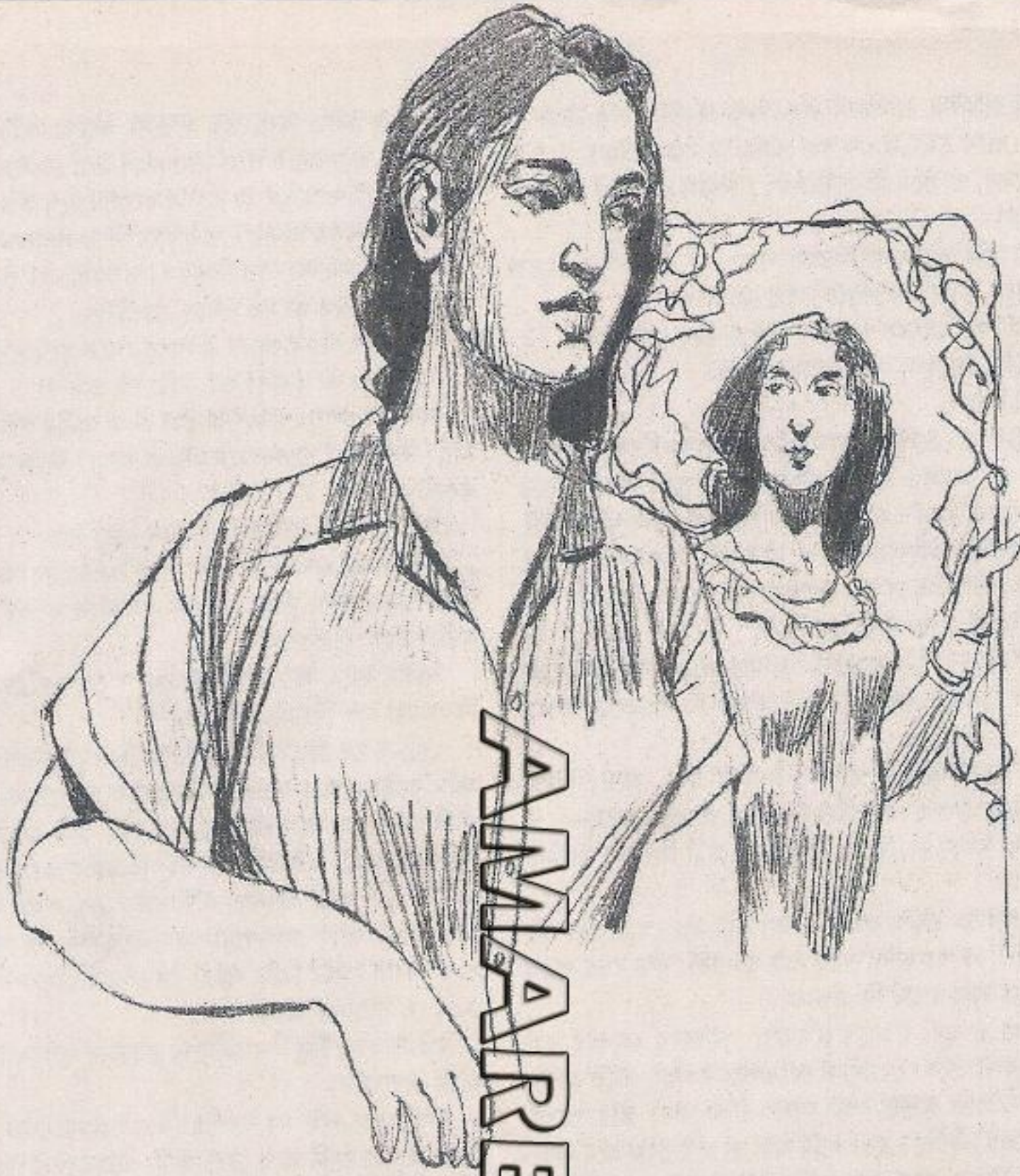
খানিক পরেই তিনি পায়ের শব্দ পেলেন সিঁড়িতে। কুহু উঠে আসছে। আরও দশ-পনেরো মিনিট বইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন অমিতা। হ্যাঁ শুধু তাকিয়েই থাকা, মন বসছে না একেবারে।

তার পর শুয়ে পড়লেন এবং উঠেও পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে। দ্রুত পায়ে চলে এলেন কুহুর ঘরে। এখন বাইরে জোর ঝড়-বৃষ্টি।

কুহু এই সবে মাত্র পোশাক বদলেছে। ছেলেদের মতন একটা ঢোলা পাজামা, আর একটা পুরো হাতা শার্ট, পেটের খানিকটা অংশ ও নাভি দেখা যাচ্ছে।

খাটের এক পাশে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে কুহু, অমিতা এসে বসলেন তার পাশে। মেয়ের কাঁধে একটা হাত রেখে তিনি খানিকটা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কুহু, তোর কী হয়েছে বল তো?

কুহু বলল, কী হয়েছে, মা?

অমিতা বললেন, কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই। আমি ঠিক বুঝতে পারছি। তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস।

কুহু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, লুকোচ্ছি না মা। বলবার জন্যই তো এসেছি। কিন্তু ঠিক কী ভাবে শুরু করব, সেটা বুঝতে পারছি না।

কিছু গণ্ডগোল হয়েছে? তুই আমায় সব খুলে বল।

ঠিক আছে। আগে এটা শোনো। আমি এখানে কালকের দিনটাও থাকব। পরশু সকালে আমি ছেলেমেয়েকে নিয়ে চলে যাব, ইন্টারনেটে একটা কটেজ বুক করেছি নিউ হ্যাম্পশায়ারে। সেখানে ওদের সঙ্গে কাটাব এই উইক এন্ডটা।

সে তো ভাল কথা। ওদেরও একটা আউটিং হবে।

হয়তো ওদের সঙ্গে এটাই শেষ জড়ামড়ি করে সময় কাটাব। সোমবার থেকে ওরা চলে যাবে হস্টেলে।

হস্টেলে যাচ্ছে? আগে কিছু বলিসনি তো। হঠাৎ ঠিক হল?

হ্যাঁ। জায়গাও পাওয়া গেল। সেটাই ওদের পক্ষে ভাল হবে। ছেলেমেয়েদের তো ছেড়ে দিতেই হবে, মা। স্কুল শেষ হলে ওরা কি আর বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকবে? আমিই কি তোমাদের কাছে থেকেছি? যে-দেশের যা নিয়ম। এ জন্য বাবা-মায়েদেরও আগে থেকে তৈরি হওয়াই ভাল। শুধু শুধু মায়া বাড়ালে দুঃখ পেতেই হয়।

তাও কি সহজে মায়া কাটানো যায় নাকি? মুখের কথা!

ওরা হস্টেলে চলে যাচ্ছে বলে আমিও ঠিক করলাম, এখন কিছু দিন একেবারে স্বাধীন ভাবে জীবন কাটাব।

স্বাধীন ভাবে জীবন কাটাবি ... তার মানে?

অন্তত এক বছর চাকরি করব না। ভাবছি, কোনও ইউনিভার্সিটিতে ক্রিয়েটিভ রাইটিং-এর একটা কোর্স নেব।

এ ব্যাপারে প্রদীপের কী মতামত?

প্রদীপের সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক থাকছে না।

অমিতা বেশ জোরে বলে উঠলেন, কী?

তার পর বেশ কয়েক মুহূর্ত মা আর মেয়ে মুখোমুখি তাকিয়ে একেবারে চুপ।

কুহু ঝুপ করে মায়ের কোলে শুয়ে পড়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, আমি ডিসিশান নিয়ে ফেলেছি মা। এটাই ভাল হবে।

অমিতা ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, ডিসিশান নিয়ে ফেলেছিস, প্রদীপের সঙ্গে তোর হলটা কী?

আমাদের আর মনের মিল নেই।

মনের মিল নেই বললেই হল? একটা কংক্রিট কিছু না থাকলে ... প্রদীপ এত ভাল ছেলে...

তোমাদের প্রদীপ সত্যিই ভাল ছেলে। তা বলে তার সঙ্গে কি চিরকাল আমার মনের মিল থাকতেই হবে?

কুহু, বাজে কথা বলে আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করিস না তো! ইজ দেয়ার এনি থার্ড পার্সন? তুই অন্য কারও সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিস!

কুহু হেসে ফেলে বলল, প্রথমেই আমার কথা ভাবলে? তোমার ধারণা, আমি একটা অতি দুষ্টু মেয়ে, যে কোনও সময় একটা কিছু উল্টোপাল্টা কাজ করে ফেলতে পারি। আমার সম্পর্কে তোমার এ রকম একটা ভয় আছে, আমি জানি। আমি তো একটু এক্সট্রোভার্ট ধরনের, তাই আরও কেউ কেউ বোধহয় এ রকম ভাবে। কিন্তু মা, নিজের জীবন নিয়ে সে রকম কোনও সিরিয়াস দুষ্টুমি আমি এ পর্যন্ত করিনি। বার তিনেক সে

রকম সিচুয়েশান হয়েছিল, প্রলোভন ছিল, কিন্তু আলটিমেটলি নিজেকে সামলেছি। নো, দেয়ার ইজ নো সেকেন্ড পার্সন ইন মাই লাইফ!

অমিতা বললেন, তা হলে কি প্রদীপের ... বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, এত ভদ্র ছেলে।

ভদ্র ছেলেরা বুঝি অ্যাফেয়ার করতে পারে না? যে-সব ছেলেদের মনে হয় খুব লাজুক, তারাই মেয়েদের কাছে মিচকে শয়তান।

তুই প্রদীপকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিস? কিংবা কিছু দেখেছিস?

না কিছু দেখিনি। জিজ্ঞেস করেছিলাম সরাসরি।

কী বলল, কী বলল?

তুমি তো জানো মা, তোমাদের জামাইটি পারতপক্ষে মিথ্যে কথা বলে না। কিন্তু মিথ্যে না বললেও তো ইভেসিভ হওয়া যায়। আসলে বছর খানেক ধরে ও কেমন যেন বদলে গেছে। তোমাকে খোলাখুলি বলছি, সেই যে আমার একবার মিসক্যারেজ হল, তার পর থেকেই দীপ আমার শরীর সম্পর্কে যেন ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলেছে। হি হার্ডলি টাচেস মি দিজ ডেইজ, পাশাপাশি শুই, কিন্তু নাথিং হ্যাপেন্‌স।

এ আবার কী ব্যাপার। মিসক্যারেজ তো অনেক মেয়েরই হয়। কিছু দিন পরেই শরীরে তার আর কোনও চিহ্ন থাকে না। বিশেষ করে তোদের মতন বয়েসে—

দীপ হয়তো ভাবে, আমার শরীরটা অপবিত্র হয়ে গেছে। কিংবা আমার শরীরের মধ্যে এখনও ফিউ রিমেইনস অব আ ডেড চাইল্ড—

যাঃ, বাজে কথা বলিস না। তুই প্রদীপকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেই পারিস।

তার আগে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি মা। ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ। নারী ও পুরুষদের মধ্যে ওই ব্যাপারটা কত বছর পর্যন্ত চলে? মানে তোমার আর বাবার কি এখনও...

ওয়ান্‌স ইন আ ব্লু মুন। ন'মাসে ছ'মাসে। পুরুষদের বোধহয় ওই ডিজায়ারটা অনন্ত কাল থাকে। মেয়েদের মেনোপজের পরই আস্তে আস্তে একটা চেঞ্জ আসে, তাও অন্তত বছর দশেক টানা যায়। তার পরেই ঠাকুরদেবতার পুজোয় মন দিতে হয়। স্বামী আর স্ত্রী ভাই-বোন হয়ে যায়। পরস্পরের ওপর নির্ভরতা বাড়ে, আবার ঠোকাঠুকিও লাগে। তোদের এই বয়েস ... আমি প্রদীপকে বুঝিয়ে বলব?

ধড়মড় করে উঠে বসে কুহু বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও মা! এর মধ্যে তোমাদের কোনও ভূমিকা নেই। এভরিথিং ইজ সেটেলড্‌। ওই সব আলোচনা টালোচনার টাইম ইজ ওভার। তুমি জানতে চাইলে, তাই বলি, দীপকে আমি সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওর উত্তরটা অদ্ভুত। মিথ্যে কথা নয়, অদ্ভুত। ও বলেছিল, আই থিংক, আই অ্যাম হ্যাভিং অ্যান অ্যাফেয়ার উইথ অ্যানাদার পার্সন!

অমিতা ভুরু কুঁচকে বললেন, আই থিংক মানে?

সেটাই তো কথা। আমি ওকে বললাম, কী বলতে চাও, স্পষ্ট করে বলো। ও আবার বলল, আই থিংক, পারহ্যাপস আই অ্যাম হ্যাভিং অ্যান অ্যাফেয়ার উইথ অ্যানাদার পার্সন। বাট ওয়ান থিং ইজ ফর শিয়োর, আই ডোন্ট লাভ এনি আদার পার্সন!

সত্যি এ রকম অদ্ভুত কথা আমি আগে কখনও শুনিনি।

ভাবো তো! উনি বলতে চান, উনি এখনও আমাকে ভালবাসেন, কিন্তু অন্য একজনের সঙ্গে অ্যাফেয়ার করে বেড়াচ্ছেন। সে ছেলে বা মেয়ে যাই-ই হোক।

এ আবার তুই কি আজেবাজে কথা বলছিস।

আজেবাজে নয় মা। এ দেশে এটা এখন আকছার হচ্ছে। বিয়ের বেশ কিছু বছর পর কোনও কোনও পুরুষ রিয়েলাইজ করছে, তার ভেতরের টেন্ডেন্সি গে হবার দিকে। তখন বউকে ছেড়ে কোনও পুরুষের সঙ্গে থাকছে।

প্রদীপ আজকাল প্রায়ই সানফ্রান্সিসকো যায়।

অফিসের কাজে যেতে হয়। ওদের অফিসের তো ওখানেই হেড কোয়ার্টার।

ওখানেই তো যত রাজ্যের ওই সব ছেলেরা থাকে।

আমি বলছি না যে ও ওই রকমই কিছু মিন করেছে। তা ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, আই ডোন্ট কেয়ার। তবু ইচ্ছে করছিল, ওকে ঠাস ঠাস করে দুটো চড় মারি।

মারলি না কেন?

মারাই উচিত ছিল, তবু মারিনি। আমার শরীর সম্পর্কে ইন্টারেস্ট হারিয়ে ও অন্য কারও সঙ্গে অ্যাফেয়ার করে বেড়াচ্ছে, এতে আমার এমন অপমান বোধ হয়েছিল যে রাগের বদলে চোখে জল এসে গিয়েছিল।

অমিতা কুহুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। ভাঙা ভাঙা গলায় আপন মনে বললেন, এত কিছু যে এর মধ্যে ঘটে গেছে, তা বিন্দুবিসর্গও টের পাইনি। গত মাসেও প্রদীপ এসেছিল—

কুহু বলল, মা-বাবাদের এ সবের থেকে দূরে থাকাই ভাল।

তুই এখন কী করবি? ওই বাড়িতেই থাকবি?

মাথা খারাপ? এর পর আর ও রকম স্বামীর সঙ্গে এক বাড়িতে থাকা যায়? লিগালি না হলেও মনে মনে ও আমার প্রাক্তন স্বামী হয়ে গেছে এর মধ্যেই।

তাহলে তোর জিনিসপত্র এখানে নিয়ে আয়।

নো, মাদার ডারলিং। স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্সের পর বাবা-মায়ের কাছে ফিরে আসে ন্যাকা ন্যাকা মেয়েরা। তোমাকে বলেছি না, আমি কিছু দিন স্বাধীন ভাবে বাঁচতে চাই।

স্বাধীন ভাবে, মানে, সে তো এখানে থেকেও, তোর কোনও ইচ্ছেতে কি আমরা বাধা দিয়েছি কখনও?

শোনো, যত দিন আমি এ বাড়িতে ছিলাম, এখনও যখনই আসি, তখন আমি অমিতা আর অমলেশ সরকারের আদুরে কন্যা। যত দিন নিউ জার্সিতে দীপের সঙ্গে থেকেছি, তত দিন আমি একজনের স্ত্রী আর দুটি ছেলেমেয়ের মা। এই বার আমি ওই সব ভূমিকাগুলো ছাড়তে চাই। চাকরি করব না এক বছর, আলাদা বাড়ি ভাড়া নেব, ব্যাঙ্কে আমার যথেষ্ট টাকা আছে। নতুন ভাবে লেখা-পড়া করব। ইচ্ছে করলেই তো আমি যে কোনও সময় আবার চাকরি নিতে পারি। সে কোয়ালিফিকেশন আমার আছে। এ দেশে সে সুযোগও আছে।

তুই তা হলে কিছু দিন অনীশের ফ্ল্যাটটায় থাক। ওটা তো খালিই পড়ে আছে একেবারে।

বলছি তো, এই সব ব্যাপার নিয়ে তোমরা প্লিজ মাথা ঘামাবে না। আমার ব্যবস্থা আমি করে নেব। আমি একেবারে উধাও হয়েও যাচ্ছি না। তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব ঠিকই। মাঝে মাঝে এসে তোমার রান্না খেয়ে যাব। সোনামুগ ডালের স্টক রেখো।

কুহু, তুই জীবনের এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছিস, তোদের ভয়-ডর নেই, কিন্তু আমাদের বয়েস হয়েছে, ভয় ভয় করে, নিজের দেশের অনেক সংস্কার আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে...

আরও আধঘণ্টা পরে অমিতা ফিরে এলেন নিজেদের ঘরে। আলো জ্বালেননি, ঢুকেছেন পা টিপে টিপে, তবু অমলেশ জেগে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, এতক্ষণ কী কথা হল মেয়ের সঙ্গে?

অমিতা বললেন, অনেক কথা হল। একটা খুব সিরিয়াস ব্যাপার ঘটেছে। সেটা তোমায় কাল সকালে বলব বরং। এখন তুমি ঘুমোও।

অমলেশ স্প্রিং-এর মতন উঠে বসে বললেন, আমার মেয়ের জীবনে একটা কিছু সিরিয়াস ব্যাপার ঘটেছে, সেটা না শুনে আমি এখন ঘুমোতে পারব? আমি কি একটা নরপশু!

অমিতা যত দূর সংক্ষেপে বিষয়টি জানালেন।

শোনার পর একটুক্ষণ গম্ভীর থেকে অমলেশ বললেন, তুমি শুনলে হয়তো বিশ্বাস করবে না, আমি আজ সারা দিন এ রকমই একটা কিছুর আশঙ্কা করছিলাম। যখনই শুনলাম, মেয়েটা হঠাৎ আসছে, তখনই মনে হল, একটা কিছু মিড লাইফ ক্রাইসিস, তবে এতটা গুরুতর তা বুঝিনি। শোনো, কুহু জেদি মেয়ে, ও যা ঠিক করেছে, আমাদের হাজার অনুরোধেও তা ওল্টাবে না। তুমি ওকে বেশি উপদেশ দিতে যেও না। দেখ, শেষ পর্যন্ত কী হয়—

তিনি অমিতাকে জড়িয়ে ধরে শুইয়ে দিলেন। তার পরই চমকে উঠে বললেন, তোমার আবার জ্বরটা অনেক বেড়েছে। নিশ্চয়ই ওষুধ খাওনি।

॥ ৩ ॥

আধ চামচ নুন

নুন।

একটুখানি নুনের জন্য উষসী যুদ্ধ ঘোষণা করে ফেলেছে, মনে মনে। সকালের দিকে উষসীর অনেকটা সময় যায় ঘর সাজাতে। এ

অনেকটা পুতুল খেলার মতন। সত্যিই তার অনেক পুতুল আছে। তার বিশেষ সংগ্রহ নৃত্যরতা নারী বা নাচুনে মেয়ে। বিভিন্ন দেশ থেকে সে এগুলো সংগ্রহ করে আনে। মাটি, পাথর, রুপো, জেড, নানান ধাতুর তৈরি, সংখ্যায় প্রায় নব্বইটা।

সেই সব পুতুল সে এক তাক থেকে অন্য তাকে সরায়। কোনওটি হাতে নিয়ে সে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে। কাল্পনিক ধুলো ঝাড়ে, কখনও জানলার ধারে দাঁড়ায়। সেই সব পুতুলের মধ্যে সে দেখতে পায় নিজেকে।

উষসী নিজেও নাচতে জানে। নিছক শখের নাচিয়ে নয়, রীতিমতন নর্তকীই বলা যায় তাকে। থাঙ্কমণি কুট্টির কাছে ক্লাসিক্যাল নাচ শিখেছে। দেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করত, রবীন্দ্র সদনে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে তার নামভূমিকার বেশ প্রশংসা বেরিয়েছিল ইংরিজি-বাংলা খবরের কাগজে।

এর পরের ধাপ ছিল নৃত্যশিল্পী হিসেবে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করা অথবা সিনেমায় তারকা হবার সুযোগ নেওয়া। কিন্তু খ্যাতি কিংবা পাবলিক লাইফের প্রতি সকলের ঝোঁক থাকে না। যেমন স্কুল-কলেজে পড়ার সময় অনেকে কবিতা-টবিতা লেখে, কেউ কেউ বেশ ভালই লেখে, কিন্তু পুরোপুরি সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হবার দিকে অনেকেরই ঝোঁক থাকে না, প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে লেখাটেখা ছেড়েই দেয়।

উষসীও তাই করেছে। নাচ শিখেছে, নাচতে পারে, কয়েকটা অনুষ্ঠানে কিছু লোকজনের প্রশংসা পেয়েছে, তাই-ই তো যথেষ্ট। তা বলে সারা দেশে নেচে বেড়াবার উৎসাহ তার ছিল না। একবার দুর্গাপুরে একটা অনুষ্ঠানে সে নাচতে গিয়েছিল, ফিরতে ফিরতে রাত দুটো। সে বারেই উষসী বুঝেছিল, ও সব ধকল তার পোষাবে না। আর সিনেমার কাজে কাগজে কাগজে প্রায়ই ছবি ছাপা হয় বটে, কিন্তু দিন নেই, রাত নেই, অনেক পরিশ্রম করতে হয়, আউটডোর শুটিং-এ বাইরে থাকতে হয় প্রায়ই। ছবি ছাপার মোহ তাকে পেয়ে বসেনি। তা ছাড়া জীবিকার সঙ্গে এ সবের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

উষসী জন্ম থেকেই সচ্ছলতার মধ্যে মানুষ হয়েছে, টাকা-পয়সা নিয়ে কখনও চিন্তা করতে হয়নি। কিছুটা দারিদ্র থাকলে প্রতিভা বিকাশের সম্ভাবনা বেশি থাকে। অতি দারিদ্র আবার অনেক প্রতিভা নষ্ট করে দেয়, যেমন অতি সচ্ছলতা কোনও সৃষ্টিশীলতা নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাদের পরিবার এককালে ছিল জমিদার। এখন ব্যবসায়ী।

অল্প বয়েস থেকেই উষসী ভেবে রেখেছিল, সে ইংল্যান্ড-আমেরিকায় গিয়ে থাকবে। সেই ভাবে সে তৈরি হয়েছে। ভাল ইংরিজি স্কুলে পড়েছে, পশ্চিমী আদবকায়দা শিখেছে। তিন বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে ছোট, বাড়ির বেশি আদরের। বড় দিদি বিয়ের পর থাকে জার্মানির হামবুর্গে, পরের দিদির স্বামী মিলিটারির একজন উঁচু অফিসার, থাকতে হয় ভারতের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে। যথা সময়ে সম্বন্ধ করে উষসীর বিয়ে হল রণজয়ের সঙ্গে।

পাত্র হিসেবে রণজয় হিরের টুকরো ছেলে। যাদবপুরে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সে ফার্স্ট হয়ে আমেরিকায় চলে আসে। পিএইচ ডি করে এম আই টি-তে। তার পর ভাল চাকরি। তার বাবা-মা দু' জনেই অল্প বয়েসে বিগত, মামাবাড়িতে মানুষ, টিউশানি করে নিজের পড়ার খরচ চালাতে হয়েছে। একটা লড়াইয়ের মনোভাব নিয়ে সে পড়াশুনো ছাড়া অন্য কোনও দিকে নজর দেয়নি। সে ঠিকই করেছিল, ফার্স্ট তাকে হতেই হবে।

আমেরিকায় ভাল চাকরি পাবার পর সে তার মামার নামে প্রচুর টাকা পাঠিয়েছে, দুটি মামাতো ভাইয়ের সম্পূর্ণ পড়াশুনোর খরচ দিয়ে একজনকে আনিয়েছে এ দেশে।

রণজয়ের আরও সৌভাগ্য খুলে গেল বিয়ের দু' বছর আগে। এক আমেরিকান বন্ধু তাকে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের পার্টনার করে নিল। চাকরিতে তার মাইনে ছিল যথেষ্টরও বেশি, আরও অর্থাগম হতে লাগল ব্যবসা থেকে।

আগে সে থাকত একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে। তার আমেরিকান বন্ধুটি বলল, কোনও কম্পানির ডিরেক্টরের পক্ষে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ থাকা মানায় না, বড় দেখে বাড়ি কেনো।

সেই বড় বাড়ি সাজিয়ে গুছিয়ে রণজয় দেশ থেকে বিয়ের নামে এক সুন্দরী যুবতীকে হরণ করে নিয়ে এল।

এক সচ্ছল পরিবার থেকে এসে একটি সুন্দর বাড়িতে অবতীর্ণ হল উষসী। এখানকার রাস্তায় ভিখিরিরা চ্যাঁচায় না। হকাররা হাঁকে না। অবিরাম ট্রাফিকের উৎকট শব্দ হয় না, এই যা। আর খুব বেশি তফাত নেই।

অবশ্য একটা বড় তফাত আছে। উষসীর বাপের বাড়িতে, যৌথ পরিবারে, জনা পাঁচেক কাজের লোক ছিল, এখানে একজনও নেই। শুধু সপ্তাহে একদিন একজন মেড এসে ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে দিয়ে যায়।

প্রথম কয়েক দিন দোকানের খাবার।

কিন্তু রণজয় দোকানের খাবার তেমন পছন্দ করে না, সে ভাত-প্রিয় বাঙালি। এখানে ছাত্র হয়ে আসার পর সে নিজেই কিছু কিছু রান্নায় হাত পাকিয়েছিল। উষসী একেবারেই রান্না জানে না। শুধু ডিমসেদ্ধ আর চা বানাতে পারে, তাও টি ব্যাগে। রণজয়ই অফিস থেকে ফিরে রান্না করে খাওয়াতে লাগল নববধূকে।

কয়েক সপ্তাহ পরেই চক্ষুলজ্জায় রান্না শিখতে শুরু করল উষসী। রাইস কুকারে ভাত চাপালে ফ্যান গালতে হয় না। অবশ্য ঠিক মতন জল না দিলে আঠা-আঠা ভাত হয়, চিনেরা যাকে বলে স্টিকি রাইস। রণজয়ের তাতে আপত্তি নেই। সেই ভাতের সঙ্গে ডিমসেদ্ধ আর আলুসেদ্ধ মাখা। তার পর বেগুন ভাজা, জুকিনির সঙ্গে শ্রিম্প, দেশের লাউ-চিংড়ির মতন। ক্রমে আট-দশ রকমের রান্নায় সিদ্ধহস্ত হয়ে গেল উষসী। একবার দেশে গিয়ে সর্ষে-ইলিশ আর পাঁঠার মাংসের ঝোল রান্না শিখে এল এক মাসির কাছ থেকে। এখন সে পনেরো-কুড়ি জন অতিথিকে অনায়াসে রেঁধে খাওয়াতে পারে।

নর্তকী যদি প্রাইমা ডোনা হয়, তবে তাকে সুন্দরী হতেই হবে। উষসী যথার্থ রূপসী, তার দিদিদের তুলনায় তাকেই সবাই বেশি সুশ্রী বলত। ছিপছিপে তন্বী, সাধারণ বাঙালি মেয়েদের তুলনায় খানিকটা দীর্ঘকায়া, রক্ত-চন্দনের মতন গায়ের রং। কেউ কেউ বলত, তার মুখের আদল অনেকটা সুচিত্রা সেনের মতন। যদিও সুচিত্রা সেনের চেয়ে তার নাকটা বেশি উঁচু, কিন্তু টানা টানা চোখের জন্য তা বেমানান হয়নি, তবে ভুরু কোঁচকালে তার মুখটা তীক্ষ্ণ দেখায়।

অবিলম্বেই স্থানীয় বাঙালিদের মধ্যে তার রূপের খ্যাতি রটে গেল। অবশ্য আমেরিকার সার্থক বাঙালিরা দেশ থেকে বেছে বেছে খুব সুন্দরী রমণীদেরই ভার্যা করে আনে। যে সব মেয়েরা পড়তে আসে, তারাও সাধারণত উচ্চবিত্ত পরিবার থেকেই আসে বলে তাদের চেহারাতেও বেশ একটা ঔজ্জ্বল্য থাকে। যে কোনও বাঙালি সমাবেশে অন্তত নব্বই ভাগ মহিলাই যেমন সুতনু, তেমনই বুদ্ধির আভা-মাখানো মুখ।

তবু তাদের মধ্যেও যে উষসীর রূপের আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে, তা স্বীকার করতেই হবে। নাচ ছেড়ে দিলে সাধারণত মোটা হবার ঝোঁক দেখা যায়, উষসী কিন্তু সযত্নে তার ফিগার রক্ষা করে চলেছে। এখনও সে বেতসলতার মতন, কোমরে কোনও ভাঁজ নেই। তার মুখে চমৎকার সারল্যের ছাপ আছে, চোখ দুটি যেন সব সময় কৌতূহলী। অবশ্য উষসী তেমন সরল মোটেই নয়, সে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, আর তার বাস্তব বুদ্ধিও কম নয়।

প্রথম কয়েক বছর উষসী কোনও চাকরি করেনি, করতেও চায়নি। তার স্বামীরও সে রকম ইচ্ছে ছিল না। সুন্দরী স্ত্রী সেজেগুজে থাকবে, স্বামীর সঙ্গে নানান জায়গায় বেড়াতে যাবে, পার্টিতে মধ্যমণি হবে। সেই তো যথেষ্ট। আর অন্য সময় বইটই পড়বে। দেশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোন করে বিল তুলবে প্রচুর। রণজয়ের টাকার চিন্তা নেই।

উষসী দেশ থেকে পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম এ পাশ করে এসেছে, এখানে এসে কয়েকটা কোর্স না করলে ভদ্রগোছের কিছু চাকরি পাবার কথাও নয়। এখানে এসে তার আর ছাত্রী সাজতে ইচ্ছে হয়নি। নতুন বউয়ের ভূমিকাতেই সে বেশ সুখী ছিল।

কেটে গেছে চোদ্দো বছর।

এই সময়ের মধ্যে তাদের জীবনে কী কী হয়েছে আর কী কী হয়নি, তার একটা হিসেব নেওয়া যেতে পারে।

হয়নি'র তালিকা একেবারে প্রথম, এই দম্পতি আজও নিঃসন্তান। চেষ্টাচরিত্র হয়েছে অনেক, ডাক্তারি পরীক্ষাও হয়েছে যথেষ্ট, দু'জনের স্পার্ম কাউন্ট এবং ওভারিতে কোনও দোষ পাওয়া যায়নি, বলা যেতে পারে প্রকৃতির খেয়াল।

মাঝখানে পাকাপাকি ভাবে দেশে ফিরে যাবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল উষসীর, সল্ট লেকে একটা ফ্ল্যাট কিনে সাজানোও হয়ে গিয়েছিল। মায়ের

মৃত্যুর পর সে ইচ্ছেটা চলে গেছে একেবারে। এখন দু' বছরে একবার দেশে যাওয়া হয়, তাও আগ্রা, খাজুরাহো ইত্যাদি ঘুরে কলকাতায় মাত্র সপ্তাহখানেক।

আর যা হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, রণজয়ের স্বভাবের অদ্ভুত পরিবর্তন। সেই কর্মোদ্যোগী মানুষটি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। ব্যবসা ভালই চলছে বলে ছেড়ে দিয়েছে চাকরি, কয়েকটা নিজের উদ্ভাবিত ছোটখাটো যন্ত্রপাতি পেটেন্ট নেবার ফলে ঘরে বসে আরও টাকা পায়। মাঝে মাঝে সে ল্যাবে গিয়ে বসে আর বাকি সময়টা সে যা করে, তা সত্যিই অস্বাভাবিক, মদ্যপান।

তার কৈশোর-যৌবন কিছুটা অর্থকষ্টে কেটেছে, ছাত্র বয়েসে দেশে থাকার সময় সে কোনও রকম নেশাটেশা করেনি, এমনকী সহপাঠীদের পাল্লায় পড়ে সে কখনও সিগারেট বা গাঁজাও টানেনি, মদের তো প্রশ্নই ওঠে না। এখানেও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠের সময় সে কোনও দিন মদ স্পর্শ করেনি।

এ দেশে যে সব ভারতীয় আসে, তারা অনেকেই মদটদ পান করে না। অনেক পার্টিতেই দেখা যায়, কুড়ি জনের মধ্যে অন্তত দশ জন মদের গেলাস ধরে না। নেয় ফ্রুট জুস। যারা মদ হাতে নেয়, তারাও দু'এক পেগের বেশি খায় না। বউরা তাদের দিকে নজর রাখে। মাতলামি করা খুবই নিন্দনীয় ব্যাপার, বাঙালি তথা ভারতীয়দের মধ্যে এ রকম ঘটনা কদাচিৎ দেখা যায়।

এককালে হলিউডের সিনেমা দেখলে মনে হত, সব আমেরিকানই বুঝি খুব মদ খায়। একেবারেই ভুল। চল্লিশ পার্সেন্ট আমেরিকান পারতপক্ষে অ্যালকোহল ছোঁয় না। তবে মদ সম্পর্কে কোনও ট্যাবু নেই। ষোলো বছর বয়েস হয়ে গেলে কখনও কয়েক চুমুক বিয়ার কিংবা দু'এক গেলাশ ওয়াইন পান করতেই পারে। যারা হার্ড ড্রিংকস নেয়, তারাও সংযমী। শিল্পী-কবিদের মধ্যেও অতিরিক্ত মদ্যপান ও বোহেমিয়ানিজম মোটেই ফ্যাশনেবল নয় এখন। আমেরিকানদের চেয়ে ফরাসি আর জার্মানরা ঢের বেশি মদ্যপায়ী।

তবে ব্যতিক্রম তো থাকেই। রণজয়ের বন্ধু কার্ল ফ্রিডরিশ সেই রকমই একজন, সে-ই রণজয়কে মদ্যপানে দীক্ষা দেয়। কার্ল-এর পূর্বপুরুষ জার্মান, ওরা দু' পুরুষের আমেরিকান। বংশানুক্রমে ওদের মদ্যপানের অভ্যেস, খুব বেশি পান করলেও সে সামলে নিতে পারে। আর রণজয়ের সাত পুরুষ মদের বোতলের ধারেকাছে আসেনি। কুকুরের পেটে যেমন ঘি সহ্য হয় না, তেমনিই মধ্যবিত্ত বাঙালি মদ্য সহ্য করতে পারবে কী করে? সেই জন্যই রণজয় অচিরে অ্যালকোহলিক হয়ে গেল। দুপুর হলেই তার বোতল না খুললে চলে না। এই মধ্য চল্লিশেই তার চেহারাটা থলথলে হয়ে গেছে, যদি কোনও দিন সারা দিন তার মদ্যপানের সুযোগ না থাকে, তার হাত কাঁপে। পার্টির মধ্যে কয়েক পেগ খাওয়ার পরই তার কথা জড়িয়ে যায়। উষসী তখন ওপরে পাঠিয়ে দেয় স্বামীকে।

রণজয়ের অনুভূতিও যেন অনেকটা ভোঁতা হয়ে গেছে। আগে সে সুন্দরী স্ত্রী সম্পর্কে খুব স্পর্শকাতর ছিল, কারওকে বেশি কাছে ঘেঁষতে দিত না। উষসী অমন আকর্ষণীয়া এবং বুদ্ধিমতী, তার সঙ্গে কেউ না কেউ তো ফ্লার্ট করতে চাইবেই। রণজয় বেছে বেছে সেই সব লোকদের বাড়িতে ডাকা বন্ধ করে দিত।

এখন যেন তার কিছুই আসে যায় না। এখন কেউ কেউ কোনও আসরে নানা রকম চতুর কথা ও হাসাহাসির মধ্যে টুক করে দু' একবার উষসীর গায়ে হাত দিয়ে নেয়। উষসী অবশ্য কারওকে অবাধ প্রশ্রয় দেয় না, কিন্তু শুধু একটু পিঠে বা বাহুতে হাত রাখলেই তো আপত্তি করা যায় না। রণজয় আগে এ সব সহ্য করতে পারত না, এখন দেখেও দেখে না। পার্টির মধ্যপথে সে উঠে যায়, তার পর কী হয় তা কিছুই জানে না সে।

রণজয়কে যে এক সময় কিছুটা দারিদ্রের মধ্যে কাটাতে হয়েছে, সেই অতীতটা যেন সে একেবারে ধুয়েমুছে বিদায় দিয়েছে। এখন তার হাতে প্রচুর পয়সা, বাজারের শ্রেষ্ঠ জিনিসটি তার চাই। অনেক দামি জিনিসও কিনে এনে, পছন্দ না হলে সে বিনা দ্বিধায় গারবেজে ফেলে দেয়। সকলের সামনে সে গর্ব করে বলে যে, দা বেস্ট ইজ জাস্ট গুড এনাফ ফর মি!

চেনা পরিচিতরা সামনাসামনি বলে, রণজয়দার মতন এমন দিলদরিয়া আর হয় না। আড়ালে বলে, পয়সার গরমে লোকটার মাথা বিগড়ে গেছে। যাই হোক, বাঙালি ক্লাবের বেশির ভাগ মিটিং ও খাওয়াদাওয়া এই বাড়িতেই হয়।

এতগুলি বছরে উষসীও নিজেকে অনেকটা বদলে নিয়েছে। নিছক আলস্য ও বিলাসিতায় সে সময় কাটায়নি। 'লেখা ও গান' নামে একটি স্থানীয় ক্লাবের সে সেক্রেটারি, শুধু নামেই নয়, সে প্রায়ই বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। নিজে থেকেও সে সাহায্য করে অনেককে। রমা বাগচির স্বামী হঠাৎ মারা গেলেন হার্ট স্ট্রোকে, তিনটি সন্তান নিয়ে বেশ অসহায় অবস্থায় পড়ে গিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা, সে সময় উষসী গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল। ছোট ছেলেটির বয়েস তিন বছর, তাকে সে যত্ন করে খাইয়েদাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছে। স্থানীয় বাংলাদেশিদের সঙ্গেও তার অনেকটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। এখানকার বাংলাদেশি আর পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালিদের মধ্যে কেমন যেন আলগা-আলগা সম্পর্ক, দু'পক্ষ আলাদা আলাদা অনুষ্ঠান করে, এক জায়গায় মিলতে চায় না। উষসী তাদের মেলাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

তার এখন বয়েস আটত্রিশ, এই বয়েসেও ছেলে-মেয়ের জননী হওয়া সম্ভব, কিন্তু উষসী ধরেই নিয়েছে তার আর সন্তান হবার আশা নেই। তাই মাত্র বছর তিনেক আগে সে দুটি কোর্স করে নিয়ে চাকরি নিয়েছে পাবলিক লাইব্রেরিতে, পয়সার জন্য নয় মোটেই, ফ্লেকসিব্‌ল আওয়ার্স, ভাল সময় কাটে। নানা রকম পড়াশুনোও শুরু করেছে।

উষসীর চালচলন ও ব্যবহার যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি তার সুখ্যাতি আছে। তবে তার ব্যবহারের একটা সূক্ষ্ম ত্রুটিও কারও কারও নজরে পড়ে। অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গেই তার গভীর সখ্য হয় না, সে অনেকটাই পুরুষ-ঘেঁষা। যদিও এ পর্যন্ত বিশেষ কোনও পুরুষের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে কোনও গুজব রটেনি। অনেকের সঙ্গেই সে হাস্য-পরিহাস করে, এমনকী পার্টিতে দু' এক জনের সঙ্গে ওয়াল্টজ সুরে কয়েক পাক নেচেও দেয়। কিন্তু কারও সঙ্গেই নিভৃত সম্পর্ক পাতায় না। বেশ কিছু মেয়ের সঙ্গে তার আপাতত ভাল সম্পর্ক। দু' একজন তুই তুইও বলে, তবু উষসী কিছুটা দূরত্ব রেখে দেয়। টেলিফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে না কোনও মেয়ের সঙ্গে, পারতপক্ষে কারও বাড়িতেও যেতে চায় না।

এর কারণ তার গুমোর কিংবা ঈর্ষাবোধ নয়, বরং হয়তো ভয়। উষসী ভাবে, সব মেয়েরাই তাকে মনে মনে তাচ্ছিল্য করে, অবজ্ঞা করে, কারণ সে সন্তানহীনা। এটা যেন তার দারুণ অযোগ্যতা। যে নারীর মাতৃত্ব অর্জনের ক্ষমতা নেই, সে যেন পূর্ণ নারী নয়। সবাইকে তো আর ডেকে ডেকে বলা যায় না যে তার শারীরিক গঠনে কোনও খুঁত নেই। খুব সম্ভবত উষসীর এই ভয়টা অমূলক, দু' চার জন এ নিয়ে আড়ালে বলাবলি করলেও সব মেয়েরাই এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবে কেন? এ তো ব্যক্তিগত ব্যাপার। কেউ তো সন্তান না চাইতেও পারে। ঘোষাল-দম্পতি সবাইকে জানিয়েই দিয়েছে, তারা ছেলেমেয়ে চায় না। মজুমদাররা দেশ থেকে দুটি ছেলেমেয়েকে অ্যাডপ্ট করে নিয়ে এসেছে। তবু উষসীর মন থেকে এই ভুল ধারণাটা দূর হয় না, বরং ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স-এর রূপ নিচ্ছে।

এ বার উষসীর এই কাহিনিতে প্রবেশ।

মাস দু' এক আগে প্রখ্যাত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এসেছিলেন নিউ জার্সিতে। এখানে প্রতি বছর একটি নাট্য উৎসব হয় তিন দিন ধরে, তিনি এসেছিলেন তার বিচারক হয়ে। এখন সিনেমার চেয়ে নাটকেই তিনি বেশি মনোযোগী।

কিছু দিন আগে সৌমিত্রবাবুর সত্তর বছরের জন্মদিন পালিত হয়েছে সাড়ম্বরে। তাই তাঁর বয়েস সবাই জানে। মঞ্চে কিংবা রুপোলি পর্দায় এখন তাঁকে বাবা-কাকার ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়, কিন্তু সামনাসামনি তাঁর বয়েস বোঝাই যায় না, বেশ যুবকোচিত টান টান চেহারা। একটুও ভুঁড়ি নেই, স্বভাবটিও মধুর, মুখের হাসিটি সারল্যমাখা। ব্যবহারে স্টার সুলভ অহঙ্কারের লেশমাত্র নেই, সকলের সঙ্গেই সমান ভাবে মিশতে পারেন।

যাঁরা কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে দেশ ছেড়ে এসেছেন, তাদের অনেকেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের খুব ভক্ত ছিলেন। বাংলা সিনেমার সুদিনে উত্তম আর সৌমিত্র ছিলেন দুই নায়ক, তাঁদের মধ্যে মেয়েরা বেশি ভক্ত উত্তমকুমারের, আর ছেলেরা সৌমিত্র'র। আবার এ দিক-ও দিকও আছে। উষসীর বয়েসি মেয়েরা আর একটু পরের, তারা বাংলা সিনেমাই বেশি দেখত না। তবু উষসীর মতে, অপুর সংসার ফিল্মে সৌমিত্র'র অভিনয়ের কোনও তুলনাই হয় না।

সৌমিত্রবাবু আসবার পর স্বাভাবিক ভাবেই তাঁকে বিভিন্ন বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

স্থানীয় ক্লাবের সেক্রেটারির বাড়িতে তো একদিন আনতেই হবে। সে ব্যবস্থা হয়ে গেল উর্বসীর অগ্রাধিকারে।

সৌমিত্রবাবু আগেই জানিয়েছিলেন, খুব বড় পার্টি তিনি পছন্দ করেন না, অল্প মানুষের মধ্যে তিনি স্বস্তি বোধ করেন।

তাই খুব বেছে বেছে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সাতটি দম্পতিকে। জয়ন্তী-ধীমান, আমিনা-ডক্টর আহমেদ, কুহু-প্রদীপ, সংযুক্তা-প্রবুদ্ধ, বুলবুল-শহিদ, পান্না-ফারুখ, যুঁই-দিব্য, আর ক্লাবের প্রেসিডেন্ট বিপত্নীক অংশুমান দেব। উর্বসী তার স্বামীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছে, আজ যেন সে আগেই বেশি বেশি পান করে বে-এক্তার না হয়ে যায়। অতিথিরা সব চলে গেলে সে না হয় তার বাকি কোটা শেষ করবে।

রণজয় কথা দিয়েছে, পার্টি শেষ হবার আগে সে দু' পেগের বেশি খাবে না। আগেই জানা গেছে যে সৌমিত্রবাবু হুইস্কির বদলে ব্র্যান্ডি পছন্দ করেন, তাই তাঁর জন্য আনা হয়েছে রেমি মার্ত্যাঁ ভি এস ও পি কনিয়াক। আরও সব দামি দামি পানীয়ের বোতল সাজিয়ে রাখা হয়েছে ঘরের এক কোণের শ্বেতপাথরের টেবিলে।

অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অন্যের লেখা চিত্রনাট্যের সংলাপ মুখস্থ বলে যায়, কিন্তু তাদের যে নিজস্ব আরও নানান গুণ আছে, তা দর্শকরা জানতেও পারে না। সৌমিত্রবাবু জমিয়ে গল্প বলতে পারেন একটার পর একটা, আর তিনি গানও গাইতে পারেন বেশ ভাল। রবীন্দ্রসংগীত, পল্লিগীতি, অনেক কিছু। ফিল্মে তিনি নিজের গলায় কেন গান করেন না, সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার।

আজ তিনিই মধ্যমণি, অন্যরা প্রশ্ন করছে তাঁকে। তিনি কী করে প্রথম ফিল্মে এলেন, উত্তমকুমারের সঙ্গে তাঁর রেষারেষি ছিল কি না, সত্যজিৎ রায় তাঁর সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতেন...।

এর মধ্যে অনেকের পীড়াপীড়িতে কুহুর একটা আবৃত্তি শুনিয়ে দেওয়া হল সৌমিত্রবাবুকে। জয়ন্তী দুটো গান গাইল।

সৌমিত্রবাবু বহু বার বিদেশে এসেছেন, এ সব দেশের আদব-কায়দা তিনি জানেন। কোনও বাড়িতে আমন্ত্রিত হলে গৃহস্বামিনীর প্রতি বেশি মনোযোগ দিতে হয়। আর উর্বসীর মতন হস্টেস, রূপের জ্বলন্ত শিখা, দৈর্ঘ্যের জন্য অন্য মেয়েদের চেয়ে তার মাথা উঁচুতে, বারবার চোখ চলে যায় তার দিকে।

সৌমিত্রবাবু তাকে এক সময় বললেন, আপনার এ রকম দারুণ ফিগার। সিনেমায় নামেননি কেন? এখনও নামলে মার মার কাটি কাটি হয়ে যাবে।

উর্বসী বলল, কী যে বলেন, অনেক বয়েস হয়ে গেল।

সৌমিত্রবাবু বললেন, বয়েস? আপনি জানেন, আমাদের বাংলা ফিল্মের যারা নায়িকা, তাদের এক একজনের কত বয়েস? আপনি ভাবতে পারবেন না। পঞ্চাশ বছর বয়েসেও কেউ কেউ কলেজ গার্ল সাজে। আমি নিজেও তো একটা ছবিতে একান্ন বছর বয়েসে কলেজ স্টুডেন্ট সেজেছি। বাংলা ফিল্মে এ সবই হয়। দেশে থাকতে কেউ আপনাকে অফার দেয়নি?

উর্বসী বলল, আমার দাদার কাছে দু'একজন বলেছিল, আমি পাত্তা দিইনি তখন, আমার সংসারধর্মই পছন্দ।

অনেক দিন তো সংসার করলেন, এখনও তাই ভাবেন? একটু স্বাদ বদল করতে ইচ্ছে করে না? এখনও আপনি যদি চান, অনেকে ইন্টারেস্টেড হবে। আমি যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারি।

উর্বসী কোনও উত্তর দিল না।

ফারুখ বলল, উনি কিন্তু খুব ভাল নাচতেও পারেন। এখন অবশ্য...

এ বার খেতে বসতে হবে। তার আগে ফটো সেশন। সবাই সৌমিত্রবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে চায়। উর্বসী একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল, সৌমিত্রবাবু তাকে কাছে ডেকে নিলেন। ফারুখ দক্ষ ক্যামেরাম্যান, সে ফোকাস করতে একটু দেরি করল। সৌমিত্র তাঁর এক হাত রাখলেন উর্বসীর কাঁধে।

ফ্লাশ জ্বলতেই জয়ন্তী বলল, ঠিক সুচিত্রা-সৌমিত্র। সাত পাকে বাঁধা!

রণজয় এর মধ্যেই দু' পেগের বদলে তিন পেগ খেয়ে ফেলেছে। চক্ষু কিছুটা ঢুলুঢুলু। উর্বসী তাকেও ডেকে আনল সৌমিত্রবাবুর কাছে।

সৌমিত্রবাবু বললেন, ছবির কপি পাঠাবেন কিন্তু! ঠিকানা দিয়ে যাব। অনেক জায়গাতেই ছবি তোলা হয়, কপি পাই না।

তার পর উর্বসীর দিকে ফিরে বললেন, আপনার ছবি দেখাব আমরা চেনা প্রডিউসারদের।

ডাইনিং টেবলটা মস্ত বড়। ঠিক ষোলো জনের জায়গা হয়। একটা অতিরিক্ত চেয়ার টেনে আনতে হল, উর্বসীর জন্য, সৌমিত্রবাবু তাকে নিজের পাশে বসতে বললেন।

টেবিলের ওপর নানা রকম খাবার সাজানো, অনেক পদ। আজকের জন্য একজন মেড ডাকা হয়েছে, সে সব কিছু গরম করে দিয়েছে মাইক্রোওয়েভে। দু' রকম ডাল, আলু-ফুলকপি, পটল ভাজা, এঁচোড় চিংড়ি, দু' রকম মাছ, মুর্গি আর পাঁঠার মাংস, এ দেশে যাকে বলে গোট মিট। এ ছাড়া চাটনি, ডেসার্ট।

সৌমিত্রবাবু সবিস্ময়ে বললেন, বাঃ, এত রকম আইটেম? সব কে রান্না করল? আপনি?

উর্বসী স্মিত হেসে সম্মতি জানাল।

সৌমিত্রবাবু বললেন, ইস, সারা দিন ধরে রান্না করেছেন নিশ্চয়ই! এত সব একটু একটু করে খেলেই তো দারুণ পেট ভরে যাবে। আমি তবু সব ক'টাই টেস্ট করে দেখব।

একজন বিখ্যাত ব্যক্তির মুখনিঃসৃত এই সব কথা শুনলে কার না আনন্দ হয়। উর্বসীর গালে রক্তিম ছোপ দেখা গেল। সে নিজে খাবার তুলে দিতে লাগল সৌমিত্রবাবুর প্লেটে।

খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আড্ডা চলছে। আজ শুক্রবার, কারও কোনও তাড়া নেই।

মধ্য পথে কুহু হঠাৎ বলে উঠল, এঃ হে, এই কড মাছে যে বড্ড বেশি নুন হয়ে গেছে। উর্বসী, দু'বার নুন দিয়ে ফেলেছ নাকি?

সবাই কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ।

কুহু আবার বলল, এত ভাল মাছটা, তুমি বোধহয় ভুল করে দু'বার নুন দিয়েছ।

উর্বসীর মুখখানা ফিউজ হয়ে যাওয়া বাল্বের মতন দেখাল। প্রদীপ কুহুর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে যেন বলতে চাইল কিছু।

এর মধ্যে অনেকেই কড মাছ নিয়েছে, কেউ বেশি নুনের কথা বলেনি, আবার কুহুর কথার প্রতিবাদও করল না। কেউ বলল না, আমি তো খেয়েছি, আমার তো বেশি নুন লাগেনি।

কুহু এর পর বলল, উর্বসী কিন্তু দারুণ রান্না করে। চিকেন কোর্মা কী ভাল হয়েছে!

একটু দেরি করে ফেলে রণজয় খানিকটা জড়ানো গলায় বলল, ওই কড মাছের ঝোলটা আমি রান্না করেছি। আমিই বোধহয় নুন বেশি দিয়েছি।

কিন্তু এর আগেই জানা হয়ে গেছে যে সব আইটেমই উর্বসীর রান্না, সুতরাং রণজয়ের এই শিভালরি মাঠে মারা গেল।

কথা ঘোরাবার জন্য সৌমিত্রবাবু বললেন, সত্যি চিকেন কোর্মাটা অপূর্ব। আরও অনেক কিছুই... একটা সত্যি কথা বলছি, এখানে অনেক বাড়িতে আমি এত ভাল সব রান্না খেয়েছি যে দেশেও তেমন ভাল হয় না। আসলে এখানে সব কিছুই তো একেবারে খাঁটি। শুধু রান্না কেন, অনেকের মধ্যে এত ট্যালেন্ট দেখেছি, কেউ কেউ এত ভাল গান গায় যে মনে হয়, দেশে থাকলে তাদের খুব নাম হত।

অংশুমান দেব বললেন, অনেকে ভাল লিখতেও পারে। আমাদের ক্লাবে মাঝে মাঝে রচনা পাঠ হয়, তার মধ্যে কিছু কিছু বেশ হাই স্ট্যান্ডার্ড। অবশ্য ইংরিজিতে।

শহিদ বলল, কেউ কেউ বাংলাতেও লেখে, যেমন পান্না আর ফারুখ দু' জনেই ভাল গল্প লেখে বাংলায়।

সৌমিত্রবাবু বললেন, তা তো নিশ্চয়ই।

খাওয়ার পর সৌমিত্রবাবু ফারুখের সঙ্গে বাইরে গেলেন সিগারেট খেতে। এর আগে তাঁকে বলা হয়েছিল, তিনি ভেতরে বসেও খেতে পারেন। তাঁর জন্য স্পেশাল কনসেশান, ভদ্রতা দেখিয়ে তিনি রাজি হননি। আগেও বাইরে গেছেন দু'বার।

বিদায় নেবার সময় কুহু উর্বসীর কাছে এসে বলল, আমি ও রকম নুনের কথাটা বলে ফেললাম, তুমি কিছু মনে করনি তো? প্রদীপ আমাকে বলল, ও ভাবে বলা আমার উচিত হয়নি। আমার তো ফর্মালিটির কথা মনে থাকে না, যখন যা মনে আসে, তুমি প্লিজ রাগ কোরো না।

মনের মধ্যে অপমানের আগুন জ্বলছে, তবু মুখে সরল হাসি ফুটিয়ে উর্বসী বলল, না না, রাগ করব কেন? তুমি তো ঠিকই বলেছ। তুমি খুব

ভাল রান্না কর, তোমার কাছ থেকে কয়েকটা রেসিপি শিখে নেব।

কুহু বলল, আমি মোটেই ভাল রান্না করি না। কোনও মতে হুড়ুম ধাড়ুম করে কাজ চালিয়ে দিই। রান্নার আসল ব্যাপার হচ্ছে নুন, কম হলে ক্ষতি নেই, বেশি হলেই মুশকিল, তখন খানিকটা লেবুর রস, রান্নার সময় নিজে একটু চেখে দেখা উচিত।

আর কে কখন বিদায় নিল, তা খেয়ালই করল না উষসী। মুখ নিচু করে বসে রইল এক জায়গায়। তার ধারণা হল, সবাই যেন মনে মনে তাঁকে বলছে, ইস, বেশি নুন দিয়ে আজকের খাওয়াটা মাটি করে দিলে? বাঁজা মেয়েছেলে, রান্নাও জান না!

নুন, নুন!

॥ ৪ ॥

বত্তিচেল্লির আঁকা পূর্ণাঙ্গ ছবি

দিন দশেক বাদে সকালবেলা নেশা-মুক্ত, সুস্থ গলায় রণজয় বলল, শোনো উষু, একটা ব্যাপার হয়েছে, আমাদের বিজনেসের একটা ব্রাঞ্চ খোলা হচ্ছে ওয়েস্ট কোস্টে, সিলিকন ভ্যালিতে। ক'দিন ধরে কার্ল ফোন করে বলছে, নতুন ব্রাঞ্চটা সেটআপ করার সময় কিছু দিন ওখানে গিয়ে থাকা দরকার। মনে হচ্ছে, আমাকে যেতেই হবে।

উষসী বলল, সিলিকন ভ্যালি? জায়গাটা সুন্দর?

রণজয় বলল, তা ঠিক জানি না। তবে এখানকার মতন এত সবুজ হবে না। শহরটার নাম মন্টক্লেয়ার, না-না, ভুল বললাম, আমাদের এখানকার শহরটার নাম মন্টক্লেয়ার, আর ওখানের শহরটা হচ্ছে ক্লেয়ারমন্ট। তুমি কী করবে? এখানে একা থাকতে পারবে? অবশ্য একা থাকার কোনও অসুবিধে নেই।

উষসী হঠাৎ যেন একটা নতুন উত্তেজনা বোধ করল।

এই ক'দিন ধরে উষসী যে কী মনোবেদনায় ভুগছে, তা কিছুই লক্ষ করেনি রণজয়। সেই সন্ধের কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। কী সুন্দর পার্টি জমে উঠেছিল। নুনের কথায় সব নষ্ট হয়ে গেল। সবাই নিশ্চয়ই মনে মনে তাকে দুষেছে। সৌমিত্রবাবুও এর পর আর উষসীর সঙ্গে কোনও কথাই বলেনি। বিদায় নিয়েছিলেন? নাকি সিগারেট খেতে বাইরে গিয়ে সেখান থেকেই চলে গেলেন!

এই ক'দিন উষসী আর বাইরেও বেরোয়নি, কোনও বাঙালির মুখ দেখেনি। মাঝে মাঝে সে নিজেই ভাবছে, এতটা বাড়াবাড়ি করা ঠিক হচ্ছে না, ঘটেছে একটা ব্যাপার, সেটা আস্তে আস্তে ভুলে যাওয়াই ভাল। কিন্তু ভুলতে পারছে না যে!

কুহুর ওপরেও তার অসম্ভব রাগ, এক একবার মনে করছে, কুহুকে সে ক্ষমা করে দেবে। ওই মেয়েটা এমনিতেই একটু পাগলি ধরনের, মাঝে মাঝে উল্টোপাল্টা কথা বলে, একদিন রণজয়কে বলেছিল, আপনাকে দেখলেই চার্লি চ্যাপলিনের কথা মনে পড়ে! ওটা মোটেই প্রশংসার কথা নয়, তবু রণজয় হেসেছিল!

কুহুকে ক্ষমা করতে পারছে না উষসী। মাঝে মাঝেই দাঁতে দাঁত চেপে ভাবে, ওর জীবন থেকে সব নুন কেড়ে নিতে হবে।

উষসী রণজয়কে বলল, একা থাকব কেন? আমি তোমার সঙ্গে সিলিকন ভ্যালিতে যেতে পারি না?

রণজয় বলল, যেতে পারবে না কেন? গেলে তো ভালই হয়। কিন্তু এখানে তোমার ক্লাব, এত সব বন্ধুবান্ধবী...

ও সব আমার একঘেয়ে লাগছে। অনেক দিন এই এক জায়গায়... একটা নতুন কোথাও যেতে চাই। ভাবছিলাম ইওরোপে বেড়াতে যাব। ভালই হল, ক্যালিফোর্নিয়ার দিকটা ভাল করে দেখিনি।

তোমার লাইব্রেরির কাজ?

রেজিগনেশান দেব। এমন কিছু ব্যাপার নয়।

তবে তুমি তৈরি হও। ওখানে আমাদের জন্য একটা বাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এ বাড়িটাও থাকবে। বড় জোর তিন-চার মাস পরেই ফিরে আসব।

আরও দিন ছয়েক লাগল তৈরি হয়ে নিতে। এখানকার পরিচিতদের সরাসরি কিছু না জানিয়ে ই-মেল করে দেওয়া হল সবাইকে।

তার পর রণজয়ের সঙ্গে উষসী উড়ে চলে গেল পশ্চিম উপকূলে।

সিলিকন ভ্যালিতে বাড়ির দাম অত্যধিক, দুর্লভও বটে। ক্লেয়ারমন্টে যে বাড়িটা ভাড়া নেওয়া হয়েছে, তা খুব বড় নয়, তবে বেশ ছিমছাম, পুরোনো আমলের, ওপর নীচ মিলিয়ে চারখানা ঘর, কিচেনটা সুচারু, ডাইনিং স্পেসও অনেকখানি। এখানে কাজের মেড পাওয়া প্রায় অসম্ভব, তার দরকারও নেই।

নতুন ভাবে সংসার শুরু করল উষসী। দায়িত্বের চাপে পড়ে রণজয়ও খানিকটা বদলেছে, প্রতিদিনই তাকে অফিস যেতে হয়। তবে মদ্যপান কমেনি, দিনের বেলাটা একটু-আধটু বিয়ার খায়, সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরেই স্কচের বোতল নিয়ে বসে। প্রথম ঘণ্টাখানেক ঠিক থাকে, তখনই গল্প-সল্প হয় স্ত্রীর সঙ্গে, চার পেগ পেরিয়ে গেলেই এলিয়ে পড়ে। তখন তার কোনও খাদ্য গ্রহণ করা হয় না বলে উষসী তাকে আগেই কিছু না কিছু খাইয়ে দেয়।

দুপুরে সময় কাটাবার কোনও সমস্যা নেই উষসীর। অনেক সিনেমার ডি ভি ডি আছে, টি ভি-র কেবলেও ইচ্ছে মতন অনেক সিনেমা দেখা যায়, তা ছাড়া বই আছে, মিউজিক আছে। এই সব নিয়ে পুরোনো কথা ভুলে যেতে চায় উষসী।

কিন্তু ভোলা যাচ্ছে না যে। দিন দিন আগুনটা বাড়ছে। এ দেশে কোকিল নেই, তবু যে-কোনও পাখির ডাক শুনলেই তার কুহুর কথা মনে পড়ে। সেই সন্ধ্যা। খাওয়ার পর কুহু ভাল মানুষের মতন মুখ করে বলতে এসেছিল, নুনের কথাটা বলে ফেলেছি বলে তুমি কিছু মনে করোনি তো? এ রকম অপমানের পরও কেউ যদি কিছু মনে না করে, তা হলে বুঝতে হবে, তার মন বলে কোনও পদার্থই নেই।

সে দিন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অত বার করে সিনেমার কথা বলছিলেন বলে উষসীর বুকটা দুলে উঠেছিল। আগে সে ওই প্রস্তাবে পাত্তা দেয়নি, কিন্তু অত বড় একজন স্টার যখন বললেন, তখন উষসীর নিশ্চয়ই কিছু যোগ্যতা আছে। এখন একবার সিনেমায় নামলে মন্দ হয় না।

উষসী ভগবান মানে। সে মনে করে, ভগবান তাকে অন্যদের তুলনায় অনেকটা বেশি রূপ দিয়েছেন, তা তো ঠিক। সে শুধু নিজে ভাবে না। সবাই বলে। এই রূপ নিয়ে শেষ পর্যন্ত কী হল? এক মাতাল স্বামীর সঙ্গে সারা জীবন, যে আর তার শরীরের দিকে চেয়েও দেখে না।

বয়েস তো আর থেমে থাকছে না। আর কয়েক বছর পর প্রকৃতির নিয়মেই রূপ ঝরে যাবে। তখন কেউ আর তার এই রূপের কথা মনেও রাখবে না। তবু সিনেমায় ধরে রাখা থাকলে লোকে মনে রাখত, যেমন সুচিত্রা সেন অবসর নিলেও তার রূপের কথা এখনও সবাই বলে। সৌমিত্রবাবুর প্রস্তাব শুনে সেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল উষসী।

সৌমিত্রবাবু চলে যান পরের দিনই। আর একবারও যোগাযোগ করেননি। অথচ ঠিকানা লিখে নিয়েছিলেন, প্রোডিউসারদের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছিলেন। সেই সন্ধ্যার কয়েকটি ছবি ফারুখ পাঠিয়েছিল উষসীর কম্পিউটারে, তার কাঁধে হাত রাখা সৌমিত্রবাবুর ছবিটা কী চমৎকার উঠেছিল। সব ক'টা ছবিই ভাল। ফারুখ জানিয়েছে, ছবির পুরো সেট সে পাঠিয়ে দিয়েছে সৌমিত্রবাবুকে, তিনি প্রাপ্তিস্বীকার করেননি।

অত প্রতিশ্রুতির পরও মানুষটা একেবারে চুপ হয়ে গেলেন কেন? এর জন্য কুহুই দায়ী। সে তাল কেটে দিয়েছিল, তার পর আর আড্ডা জমেনি, সৌমিত্রবাবুর আর কিছুই ভাল লাগেনি। কুহুটা আসলে দারুণ হিংসুটে, সে উষসীর অত প্রশংসা সহ্য করতে পারেনি। নিজের তো চেহারার ওই ছিরি, ঠিক যেন একটা মেয়ে-গুন্ডা।

উষসী জানে না, সৌমিত্রবাবুর মতন বিখ্যাত ব্যক্তিরা কত দেশে, শহরে, কত পরিবারে আমন্ত্রিত হয়ে যান। নিত্য নতুন মানুষ দেখেন, সেই সব মানুষের কথা, যাদের সঙ্গে এক সন্ধ্যায় মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য আলাপ হয়, তাদের কথা কি মনে রাখা সম্ভব? কারও কারও চেহারা বা কথাবার্তা হয়তো মনে একটু দাগ কাটে, আবার ভুলে যেতেও দেরি হয় না। চার-পাঁচ বার একই মানুষের সঙ্গে দেখা হলে তবু মনে থাকতে পারে।

তিনি যে উষসীকে অত প্রশংসার কথা বলেছিলেন, তা সবই ভদ্রতার কথা, খুশি করার জন্য। কিছুক্ষণের জন্য হলেও একজন মানুষকে খুশি করার অবশ্যই মূল্য আছে। সিনেমার নায়িকার সঙ্গে তুলনা করলে কোন সুন্দরী মেয়ে না মনে মনে খুশি হয়? এই বয়েসে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতন ব্যক্তিত্বের পক্ষে সিনেমার নায়িকা খোঁজা মোটেই মানায় না। তা ছাড়া পশ্চিমবাংলায় সুন্দরী মেয়ের এখনও এমন কিছু অভাব হয়নি যে

একজন প্রায় মাঝবয়েসি মহিলাকে অমেরিকা থেকে নিয়ে আসতে হবে! তা ছাড়া, চেহারা যতই সুন্দর হোক, অভিনয়ের ক্ষমতা আছে কি না, তা যাচাই করতে হবে না?

মস্ত বড় স্ক্রিন, ফ্ল্যাট টি ভি, প্রায় হলে গিয়ে ফিল্ম দেখারই অনুভূতি হয়। ডি ভি ডি-তে অস্কার পাওয়া মুভি চালিয়ে দিলেও মন বসে না। দুপুরবেলা একা একা বাড়ির মধ্যে অস্থির পায়ে ঘুরে বেড়ায় উর্বসী।

বিদেশে এসে বসবাস করার কত শখ ছিল। এখন বিরক্ত লাগে। অনেক রকম জিনিস পাওয়া যায়, নানা রকম সুবিধে আছে ঠিকই, তবু দারুণ একটা নিঃসঙ্গতা বোধ কিছুতেই কাটানো যায় না। মা-বাবা চলে যাবার পর কলকাতা সম্পর্কে আর তেমন কোনও আকর্ষণ নেই, তবু কেন সেই জন্মস্থানটা মাঝে মাঝে হ্যাঁচকা টান মারে? রণজয় তার ব্যবসাপাতি ছেড়ে আর দেশে ফিরবে না, উর্বসী একা ফিরে গেলে তাকে কিছু কিছু ব্যর্থতা তো মেনে নিতেই হবে। আমেরিকার নেশা ছুটে গেলেও এত দিন পর ফিরে সে কি কলকাতার জীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে? এখানে যতই কষ্ট হোক, উর্বসী আর ফিরবে না।

রণজয় দেশ থেকে কোনও ছেলেমেয়েকে পোষ্য করে নিয়ে আসার পক্ষপাতী নয়। সে জিন মানে, তা ছাড়া তার অত বাৎসল্যবোধও নেই। এ দেশে এখন বীর্য ব্যাঙ্ক বেশ চালু হয়েছে। সেখান থেকে অজ্ঞাতনামা কোনও পুরুষের রেতঃ এনে কোনও মহিলার গর্ভাধান ঘটানো এখন শক্ত কিছুই নয়। আমেরিকানদের মধ্যে সেটা চালু হয়ে গেছে, কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে কিছু সংস্কার আছে, তারা কেউ ওই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে বলে শোনা যায় না।

ওই ব্যাপারটার কথা ভাবলেই উর্বসীর গা ঘিন ঘিন করে।

যমজ সন্তান নিয়ে কুহু মহা ফুর্তিতে আছে। সব সময় ডগোমগো ভাব। ওর মুখের ওই হাসিটা মুছে দেওয়া যায় না? সে দিন কুহু ওই নুনের কথাটা বলার পর প্রদীপ তাকে বকেছিল। প্রদীপ ছেলেটি ভাল। রণজয়ও তার স্ত্রীর অস্বস্তি কাটাবার জন্য নিজে দায় নিতে চেয়েছিল, দ্যাটস ভেরি সুইট অব হিম।

কুহুর মুখখানা মনে পড়লেই উর্বসী ফিসফিস করে বলে, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, ক্ষমা করতে পারলেই শান্তি। মুখে এ কথা বলে যদিও, ভেতরে ভেতরে রাগটা ধিকিধিকি করে জ্বলে।

ক্ষমা আর প্রতিশোধস্পৃহা এই দুটিতে চলে টাগ অফ ওয়ার। প্রায় দেড় মাস কেটে গেছে, প্রতিশোধ নেবার কোনও চেষ্টা তো করেনি উর্বসী। ভেতরের আগুনটা আস্তে আস্তে নিভে যাবে নিশ্চয়ই।

সন্ধে সাড়ে ছটা, রণজয়ের আজ ফিরতে কিছুটা দেরি হবে বলে গেছে। দেরি মানে বড়জোর সাড়ে সাতটা-আটটায়। যতই মদের নেশা থাক, রণজয় কোনও শুঁড়িখানা কিংবা ক্লাবেটাবে যায় না, বাড়িতে এসে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে নিয়ে, এক চেয়ারে বসে অন্য একটা চেয়ারে পা তুলে দিয়ে মদ্যপান করাই সে বেশি উপভোগ করে। টি ভি দেখে না, গান শোনে। কোনও সন্ধেতেই সে বাড়ির বাইরে থাকে না।

বৃষ্টি পড়ছে কুকুর-বিড়ালকে ভয় দেখাবার মতন।

নভেম্বরের মাঝামাঝি, এ অঞ্চলে তুষারপাত হয় না, তবে বৃষ্টির জোর খুব বেশি। আর যখন তখন প্রবল বৃষ্টি। বরফ পড়ে না বলেই এ অঞ্চলে অরেঞ্জ আর আঙুর ভাল হয়। এ অরেঞ্জ কিন্তু আমাদের কমলালেবু নয়, ভেতরে কোয়া নেই। আমাদের কমলালেবুকে এরা বলে ট্যাঞ্জারিন। এখানে অনেক কিছুর নামেরই মাথামুণ্ডু নেই। বেগুনকে কেন যে এগ প্ল্যান্ট বলে কে জানে! ইংরেজরা যে ঢ্যাঁড়সকে লেডিজ ফিংগার বলে, তার তবু মর্ম বোঝা যায়। আশ্চর্য ব্যাপার, ইংরেজরা এত বছর ভারতে রইল, কখনও কি পটল খায়নি? পটলের কোনও ইংরিজি নাম নেই কেন? তেজপাতারও ইংরিজি নাম আছে। সাহেবরা কি কোনও রান্নায় তেজপাতা দেয়?

একা থাকলে কত রকম আবোলতাবোল কথাই যে মনে আসে।

সকাল ন'টায় রণজয়ের বেরিয়ে যাবার পর এ পর্যন্ত একটাও কথা বলেনি উর্বসী। কার সঙ্গে কথা বলবে? নতুন জায়গায় ফোনও আসে খুব কম। এখানকার কোনও বাঙালি কিংবা কারও সঙ্গেই পরিচয় হয়নি। নিউ জার্সির ক্লাবের বন্ধুদের সঙ্গেও সে ইচ্ছে করে এখনও যোগাযোগ করেনি।

ফরাসি-জানলা দিয়ে বাইরের বাগানে অঝোর বৃষ্টিপাত দেখতে দেখতে উর্বসীর বুকের মধ্যেও যেন একটা নদী উত্তাল হয়ে উঠল। আরও একটা দিন ব্যর্থ হতে চলেছে। এই রকম ব্যর্থতা জমিয়ে জমিয়েই সে বুড়ি

হয়ে যাবে? তার থেকে নদীতে ঝাঁপ দেওয়া ভাল নয়!

জানলার ধার ছেড়ে সে দ্রুত চলে এল কমপিউটারের কাছে। খুঁজতে লাগল কয়েকটা হোটেলের নাম।

একটু পরেই তার টেলিফোনের ডাক বাজতে লাগল একটা হোটেলের ঘরে।

একজন ফোন ধরতেই উষসী জিজ্ঞেস করল, খাওয়া হয়ে গেছে? হ্যাভ ইউ ফিনিশড ইয়োর ডিনার!

ও পাশের ব্যক্তিটি কিছু হকচকিয়ে গিয়ে বলল, না। মানে, হু আর ইউ, মে আই নো?

উষসী বলল, গলার আওয়াজও চিনতে পারছ না? আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইন্ড? আমি জানতে চাইছি, তুমি রাত্তিরের খাওয়া খেয়ে নিয়েছ কি না।

প্রদীপ বলল, উষসী? হোয়াট আ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ! তুমি আমার এখানকার নাম্বার জানলে কী করে?

সেটা কি এমন কিছু শক্ত ব্যাপার, প্রদীপ? তুমি একদিন কথায় কথায় বলেছিলে, আমাকে নয়, ক্লাবের মেম্বারদের মধ্যে জানিয়েছিলে যে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহটায় তোমাকে সানফ্রান্সিসকো আসতে হয় অফিসের কাজে।

সেটা তুমি মনে রেখেছ?

হঠাৎই আজ মনে পড়ল। আর এখানে এলে তুমি নিশ্চয়ই কোনও ভাল হোটেলেই উঠবে। তিন চারটে হোটেলে খোঁজ করার পর পেয়ে গেলাম এই মারিয়ট হোটেলে।

হাউ নাইস অফ ইউ। তোমরা নিউ জার্সি ছেড়ে চলে এলে, তার পর তো আর কথাই হয়নি।

তোমার খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে কি না, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম!

না, খাইনি। মোটে তো সাড়ে ছ'টা।

কোথায় খাও? রুম সার্ভিস?

এই হোটেলের খাবার আমার পছন্দ নয়। একটু বাদে হাঁটতে বেরোই। বাইরের কোনও রেস্তোরাঁয় খেয়ে নিই। কখনও কখনও জেটিতে গিয়ে সি-ফুড খাই।

ভাত-মাছের ঝোল বুঝি খেতে ইচ্ছে করে না মাঝে মাঝে?

ইচ্ছে হলেই বা পাচ্ছি কোথায়? ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয় সব নর্থ ইন্ডিয়ান রান্না, একই রকম মশলা।

তুমি হাঁটতে বেরোও? তোমার ও রকম হ্যান্ডসাম চেহারা, ভয় করে না? যদি কেউ ধরে নিয়ে যায়? ওখানে তো শুনেছি মেয়েদের থেকে ছেলেদের বিপদই বেশি। তোমার গাড়ি নেই?

হাঃ হাঃ হাঃ! না, এখনও কেউ আমাকে ধরার চেষ্টা করেনি। অফিস থেকে একটা গাড়ি দেয় ক'দিনের জন্য, তবু মাঝে মাঝে আমার হাঁটতে ভাল লাগে। তুমি আর রণজয়দা কেমন আছ? হোটেলের ঘরে একা একা বসেছিলাম, তুমি ফোন করলে, কথা বলতে বেশ লাগছে।

আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করোনি কেন?

তোমাদের ফোন নাম্বার জানি না।

রণজয়ের নামে ফোন নাম্বার খুঁজে বার করা কি শক্ত? আমি যে ভাবে পেলাম। চেষ্টা করোনি। আমাদের সঙ্গেই তো ডিনার খেতে পার।

কবে?

তুমি ক্লেয়ারমন্ট শহরটা চেন?

ক্লেয়ারমন্ট, হ্যাঁ, গিয়েছি একবার।

তোমার ওখান থেকে বড়জোর পঁয়তাল্লিশ মিনিট, পঞ্চাশ মিনিটের ড্রাইভ। আজই চলে এসো। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ো।

এক্ষুনি? হ্যাঁ, বেরুতে পারি, একটা জরুরি ফোন আসার কথা আছে। মিনিট পাঁচেক দেখব, তার পর এলে মেসেজে থাকবে।

তোমাদের ওখানে কি বৃষ্টি পড়ছে? এখানে কিন্তু খুব ঝড়-বৃষ্টি এখন। গাড়ি চালাতে অসুবিধে হবে না?

ঝড়-বৃষ্টিতে প্লেন ওড়াতে অসুবিধে হয়, গাড়ি চালাতে কোনও অসুবিধে নেই।

তা হলে এসো, তোমাকে এক্সপেক্ট করব উইদিন আ আওয়ার। রণজয় তোমাকে দেখলে খুশি হবে। ভয় নেই, মাছের ঝোলে বেশি নুন থাকবে না।

প্রদীপ আবার জোরে জোরে হাসল।

উষসী ফোন ছেড়ে দেবার খানিক পরেই বাড়ি ফিরল রণজয়।

উষসী একটু উল্টো করে তাকে বলল, শোনো, প্রদীপ ফোন করেছিল, অফিসের কাজে এখানে এসেছে, বেচারা রেস্তোরাঁর খাবার পছন্দ করে না। আমাদের কাছে ভাত-মাছ খেতে আসবে।

রণজয় কোট ছাড়তে ছাড়তে জিজ্ঞেস করল, কোন প্রদীপ?

উষসী বলল, নিউ জার্সির কুহু-প্রদীপ, যাদের টুইন ছেলেমেয়ে।

রণজয় সত্যিই খুশি হল। প্রদীপ অন্য অনেক নেটিপেটি পুরুষের মতন নয়, সন্ধের পর শুধু শুধু ফলের রস খেয়ে অম্বলে ভোগে না, স্কচ পান করতে ভালবাসে। পরিমিত, তবে স্ত্রী সঙ্গে না থাকলে এক আধ দিন অপরিমিত হতেও পারে।

মদ্যপানের একজন উপযুক্ত সঙ্গী পেলে কার না ভাল লাগে।

ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যেই এসে গেল প্রদীপ। এর মধ্যে এখানে বৃষ্টি থেমে গেছে।

একজন অতিথি আসছে বলে বিশেষ কোনও সাজপোশাক করেনি উষসী। সাধারণ ঘরোয়া পোশাক, তার ওপর একটা হাউজ কোট চাপানো।

একটা ছোট টেবিলে বসল তিন জন। উষসীর জন্যও খোলা হয়েছে রেড ওয়াইনের বোতল। সে অবশ্য পুরো বোতল খাবে না, বাকিটা নষ্টই হবে।

রণজয়কে একটা নতুন ল্যাব সেট আপ করতে হচ্ছে এখানে, সে সেই কথাই বলতে লাগল। সে সাহিত্য-শিল্পের বিশেষ ধার ধারে না।

নিউ জার্সির ক্লাবে একটা নাটকের রিহার্সাল চলছে, উষসীকে সবাই মিস করছে, জানাল প্রদীপ। বাংলাদেশ থেকে এক জন গায়িকা এসেছেন, তাঁর গান হল এক দিন। সত্যিই অপূর্ব গান করেন মহিলা, নামটা প্রদীপের ঠিক মনে পড়ছে না।

উষসী শুনে গেল শুধু। নিউ জার্সি সম্পর্কে কোনও আগ্রহ দেখাল না নিজে থেকে।

রণজয় প্রদীপের চেয়ে এক পেগ এগিয়ে। বোতল থেকে নিজে ঢাললে তো ঠিক পেগের মাপ হয় না, বেশিই হয়।

চার বার খাবার পরই সে এলিয়ে পড়ল।

সঙ্গে টুকিটাকি স্ন্যাক্স ছিল, তাই খেয়েছে রণজয়, সে আর ডিনার টেবিলে বসতে পারবে না। পাজামার দড়ি খুলে গেছে, বেরিয়ে পড়ছে ভুঁড়ি, এক হাতে পাজামা চেপে ধরে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, তোমরা বসো। এনজয় করো। আমি আসছি একটু পরে।

সিঁড়ি দিয়ে সে উঠে গেল ওপরে, আর নামল না।

প্রদীপ তিন গেলাস শেষ করার পর উষসী বলল, যথেষ্ট হয়েছে, তুমি আর খেও না। কাল আবার কাজে যেতে হবে না?

প্রদীপ বলল সকাল দশটায় মিটিং।

মদের গেলাসটেলাশ সরিয়ে ডিনার প্লেট সাজিয়ে দিল উষসী।

অতিথির জন্য বেশি পদ করেনি সে। ভাত, ডাল, বেগুন ভাজা, মাছের ঝোল, শিক কাবাব, চাটনি। প্রদীপকে সে যত্ন করে খাওয়াল। শুধু মাছের ঝোলের সময় তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল, নুন বেশি হয়েছে?

প্রদীপ বলল, না, না, চমৎকার হয়েছে।

উষসী বলল, সত্যি করে বলো। আমি তিন বার টেস্ট করেছি।

প্রদীপ বলল, সত্যিই বলছি। তুমি সে দিনের কথা এখনও মনে রেখেছ? কুহু ওই রকমই, যখন যা মনে আসে, ঝট করে বলে ফেলে। ওর জিভের সেনসরশিপ নেই। পরে আমাকে অনেক বার বলেছে। সবার সামনে ওই কথাটা আমার বলা উচিত হয়নি, তাই না?

উষসী বলল, বলেছে তো কী হয়েছে? একদিনের রান্নায় ও রকম একটু ভুল তো হতেই পারে। সে দিন সৌমিত্রবাবু আসবেন বলেই বোধহয় আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

প্রদীপ বলল, সৌমিত্রবাবু এখন থিয়েটার করতে লন্ডনে এসেছেন।

উষসী সৌমিত্রবাবু সম্পর্কে আগ্রহ না দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, কুহু আর তোমার ছেলেমেয়েরা ভাল আছে?

প্রদীপ দিনে তিন-চারটি সিগারেট খায়। নৈশ ভোজনের পর শেষটি।

কিন্তু এখন আবার এত জোরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে যে বাইরে যাওয়া অসম্ভব। সেই সঙ্গে বজ্রগর্জন।

উষসী তাকে উসখুস করতে দেখে বলল, তুমি ভেতরেই খাও। কিছু হবে না।

আরও কিছুক্ষণ গল্প হল। বৃষ্টি থামবার নাম নেই। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলক ও গুরু গুরু রব।

প্রদীপ বলল, উঠি, এ বার আমাকে যেতে হবে।

উষসী বলল, তুমি এই বৃষ্টির মধ্যে যাবে, আমার চিন্তা হবে। পৌঁছেই একটা ফোন কোরো।

প্রদীপ বলল, চিন্তার কিছু নেই। হ্যাঁ, ফোন করব। তুমি তখনও জেগে থাকবে?

উষসী বলল, আমি ঘণ্টাখানেক বই পড়ি। আমার কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালাতে বেশ অসুবিধে হয়। সামনেটা ঝাপসা হয়ে আসে।

প্রদীপ উঠে দাঁড়াতেই সে বলল, আজ না গেলে হয় না?

প্রদীপ বলল, কাল সকালে জরুরি মিটিং আছে।

উষসী বলল, তুমি তো বললে মিটিং দশটায়। কাল সকাল সকাল উঠে এখান থেকেই ব্রেকফাস্ট খেয়ে সরাসরি চলে যেতে পারো। তোমাকে এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ছেড়ে দিয়েছি শুনলে কুহু রাগ করবে না? গেস্ট রুম আছে, আমাদের কোনও অসুবিধে নেই।

প্রদীপ বলল, তা থেকে যাওয়া যায় অবশ্য। হোটেল থেকে কাগজপত্র নিতে হবে—

উষসী বলল, থেকেই যাও। এই বৃষ্টির সময় গাড়ি চালাতে কারও ভাল লাগার কথা নয়। তা ছাড়া, তুমি তিন পেগ হুইস্কি খেয়েছ, যদি পুলিশ ধরে? এই রকম বৃষ্টির সময় ওরা বেশি বেশি চেক করে। ভেবে দেখো।

প্রদীপ বলল, ঠিক আছে। থাকছি।

গেস্ট রুমটি এক তলাতেই।

বিছানাপত্র ঠিকঠাকই পাতা আছে, তবু উষসী একটু ঝেড়েঝুড়ে দিল। শিয়রের কাছে রাখল একটা জলের বোতল।

তার পর সে বলল, নাও, শুয়ে পড়ো। অ্যাটাচড বাথরুম। দরজা খুলে দেখে নিও। এই যে আলোর সুইচ। গুড নাইট।

প্রদীপও বলল, গুড নাইট।

সুন্দর ভাবে হাত নেড়ে চলে গেল উষসী। নিভে গেল ভিতরের সব আলো।

পোশাক বদলাবার উপায় নেই, কিছু আনেনি তো প্রদীপ। প্যান্ট শার্ট পরেই শুতে হবে। এখানে থেকে যাবার কথাও ছিল না।

একটা র‍্যাকে বেশ কিছু বই ও পত্রপত্রিকা সাজানো আছে। রাত্রে বই পড়ার অভ্যেস নেই প্রদীপের। খুব ইচ্ছে করছে, এক বার বাইরে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে। কিন্তু দরজা খোলার মুশকিল আছে, নিশ্চয়ই সিকিউরিটি অ্যালার্ম চালু করা আছে, বাজনা বেজে উঠবে।

চোখে ঘুম নেই। একটা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে উল্টে শুধু ছবিগুলো দেখল, তার পর শুয়েই পড়ল।

আলো নেভানো হয়নি, আবার উঠতে হবে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই দরজায় ঠুকঠুক শব্দ হল।

প্রদীপ বলল, ইয়েস?

বাড়িতে কুকুর না থাকলে কেউ দরজা বন্ধ করে না। ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকল উষসী।

এর মধ্যে তার পোশাক বদলে গেছে। একটা পাতলা সাদা, পা পর্যন্ত ঢোলা রাত পোশাক, তার ওপর একটা কালো চাদর জড়ানো।

সে জিজ্ঞেস করল, ঘুমোওনি? আলো জ্বলছে বলে দেখতে এলাম।

প্রদীপ বলল, ঘুম আসছে না।

উষসী জিজ্ঞেস করল, তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো? আর কিছু লাগবে?

প্রদীপ বলল, না, না, অসুবিধে আর কী? রণজয়দা ঘুমিয়ে পড়েছেন?

উষসী বলল, একেবারে অজ্ঞান।

উষসীর গা থেকে কালো চাদরটা খসে পড়ে গেল।

প্রদীপের বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। এ কী দেখছে সে?

উষসীর রাত পোশাকটা খুবই পাতলা, একেবারে সি-থ্রু।

দেখা যাচ্ছে তার সম্পূর্ণ শরীর। মর্মরের মতন গায়ের রং, সুগোল দুই স্তন, মসৃণ নিভাঁজ তলপেট, অর্ধলুপ্ত চাঁদের মতন নাভি, দুই রম্ভোরু, আর উরুসন্ধিতে রোমের গুচ্ছ। ঠিক যেন একটা ফুল, কালো রঙের।

এ কী মানবী না বত্তিচেল্লি বা টিশিয়ান কার যেন আঁকা একটা ছবি। বার্থ অব ভিনাস।

তেরো বছরের বিবাহিত জীবন প্রদীপের, বিয়ের আগেও দুটি মেয়ের সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল, তবু তার মনে হল, এই প্রথম সে কোনও পূর্ণাঙ্গ নারীকে দেখছে। এ শুধু শরীর নয়, সত্যিকারের শিল্প। ছবি, কিন্তু জীবন্ত। কালো রঙের ফুলটিতে চুম্বক।

বড় জোর পনেরো কি কুড়ি সেকেন্ড, তার পরই উষসী তার চাদরটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়াল।

প্রদীপ মুখ তুলতেই চোখাচোখি হল উষসীর সঙ্গে। তার ঠোঁটে লেগে আছে জ্যোৎস্নার মতন পাতলা হাসি।

প্রদীপ বলল, এসো।

ডান হাতের তর্জনী নেড়ে উষসী বলল, না, ঘুমিয়ে পড়ো।

প্রদীপ উঠে বসে বলল, এসো, কাছে এসো।

এক পা পিছিয়ে গিয়ে উষসী বলল, কোনও দুষ্টুমি নয়। স্লিপ টাইট, হ্যাভ নাইস ড্রিমস!

প্রদীপ বিছানা থেকে নেমে পড়তেই উষসী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, ভেজিয়ে দিল দরজা।

প্রদীপ এসে এক ঝটকায় দরজা খুলে দেখল, বাইরেটা একেবারে অন্ধকার, কোথায় মিলিয়ে গেছে উষসী।

এ দিক ও দিক হাতড়িয়ে সুইচ খুঁজে জ্বেলে দিল সব আলো। কোথাও নেই উষসী, সে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

প্রদীপের মতন শান্ত, ভদ্র মানুষেরও ইচ্ছে হল, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে সে উষসীকে খুঁজে বার করবে। সিঁড়ির কাছ পর্যন্ত গিয়েও সে অতি কষ্টে সংযত করল নিজেকে।

তবু উত্তেজনায় সে কাঁপছে। শরীরে রয়েছে খানিকটা অ্যালকোহল, শিরায় শিরায় তার ঝিলিকে যেন আগুনের ফুলকি। একটুখানি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল হলঘরে। তার পর বার কাউন্টার থেকে স্কচের বোতলটা মুঠো করে ধরে গলায় ঢেলে দিল অনেকখানি।

সারা রাত তার ঘুম এলো না। দরজা রইল হাট করে খোলা। সর্বক্ষণ মনে হতে লাগল, উষসী আবার আসবে, নিশ্চয়ই আসবে। অন্ধকারে দরজার কাছে তার আবছায়া শরীর।

এলো না।

একেবারে ভোরের দিকে প্রদীপের চোখ জুড়িয়ে এলো।

ঠিক আটটার সময় উষসীই এসে জাগাল তাকে। এখন তার অন্য পোশাক। চওড়া লাল পাড়ের সাদা খোলের একটা শাড়ি পরা, এর মধ্যেই স্নান সেরে নিয়েছে, খোলা চুল, বেশ একটা শুদ্ধ শুদ্ধ ভাব।

উষসী বলল, কী, আর কত ঘুমোবে? অফিস যেতে হবে না? বাথরুমে নতুন টুথব্রাশ আর পেস্ট আছে, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, আমি ব্রেকফাস্ট রেডি করছি।

তৈরি হতে প্রদীপের মিনিট পনেরোর বেশি সময় লাগল না। রণজয় এর মধ্যে এসে বসেছে ব্রেকফাস্ট টেবিলে।

প্রদীপকে দেখে সে বলল, কাল ফিরে যাওনি, ভাল করেছ। খুব ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল।

উষসী বলল, তুমি তো কিছুই টের পাওনি, পাথরের মতন ঘুমোচ্ছিলে।

রণজয় বলল, এই তো কাগজে পড়ছি। বার্কলেতে দুটো গাড়ির দারুণ অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। সান ফ্রান্সিসকোতে হোম-লেস পিপলরা পার্ক ছেড়ে ঢুকে পড়েছে রেল স্টেশনে।

উষসী বলল, রণ শুধু কাগজ পড়ে প্রকৃতির খবর জানে। কোনও দিন মাঝ রাত্তিরের আকাশ দেখেনি।

কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে রণজয় বলল, আই মাস্ট রান। প্রদীপ তুমি বসো, আমার ঠিক ন'টার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

রণজয় বেরিয়ে যাবার পর উষসী আর প্রদীপ মুখোমুখি।

রাত্রির লাস্যের চিহ্নমাত্র নেই উষসীর ঠোঁটে। সে প্রদীপের জন্য টোস্টে মাখন মাখাচ্ছে।

প্রদীপের খটকা লাগল। কাল রাতে কি উষসী সত্যিই এসেছিল? নাকি নেশার ঝোঁকে সবটাই কল্পনা?

এ কথাটা জিজ্ঞেস করা যায় না।

একটুক্ষণ দু'জনেই নীরব।

উষসী জিজ্ঞেস করল, তুমি কবে ফিরবে?

প্রদীপ বলল, কাল বিকেলে ফ্লাইট।

উষসী বলল, আবার সামনের মাসে কাজে আসতে হবে? তখনও
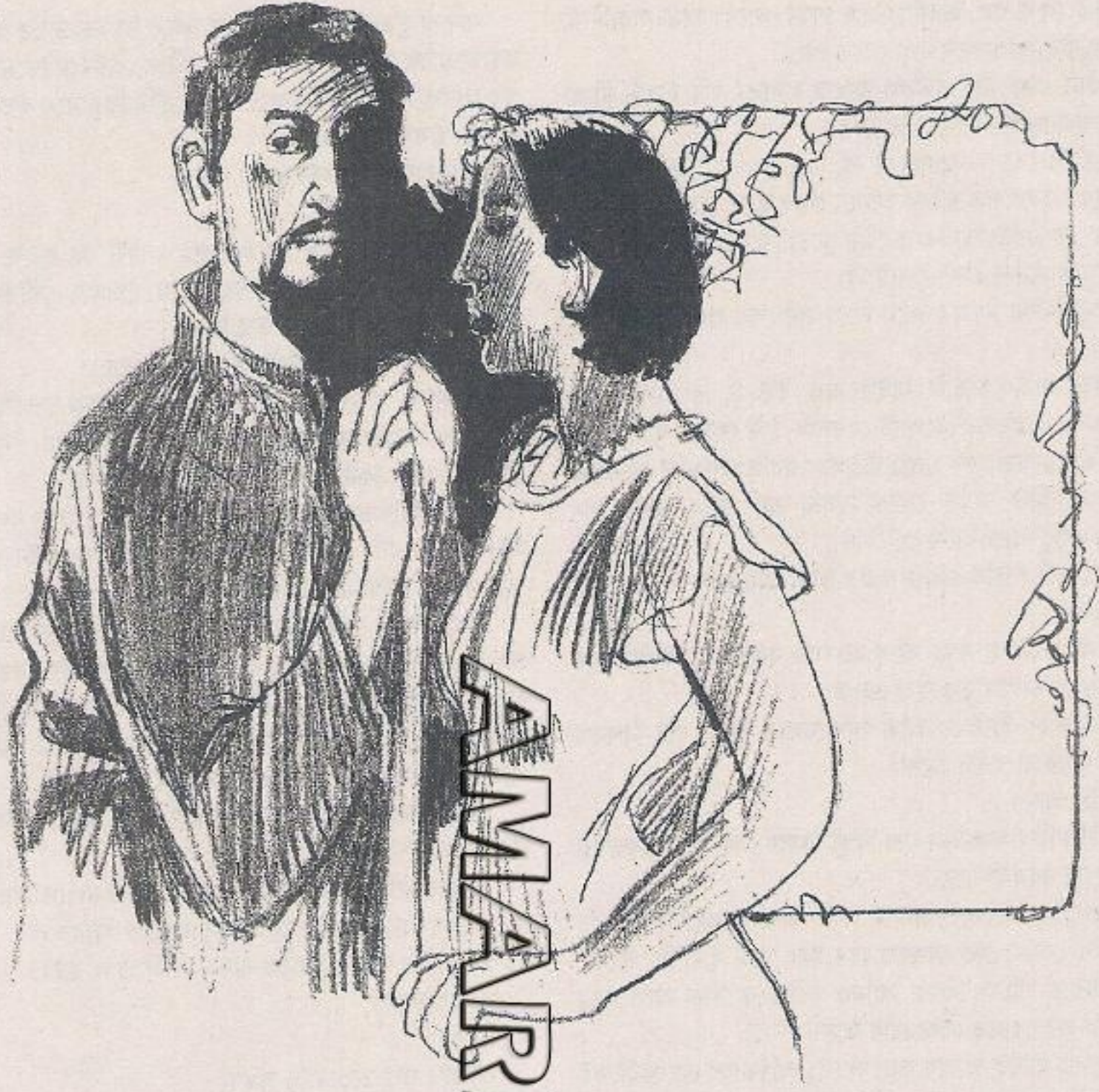
আমাদের বাড়িতে আসবে তো?

আসব।

পৌঁছেই ফোন কোরো। দেখো, সকালে আকাশ একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন গাড়ি চালাতে অসুবিধে হবে না।

আর একটু কফি দেবে?

তা দিচ্ছি। তুমি কিন্তু আর বেশি দেরি করলে জ্যামে পড়ে যাবে।

স্পষ্ট ইঙ্গিত। এর পর উঠে দাঁড়িয়ে প্রদীপ বলল, হ্যাঁ, আর দেরি করা যায় না। তুমি এখন কী করবে?

উষসী বলল, আজ আমার অনেক কাজ।

দরজা পর্যন্ত প্রদীপকে এগিয়ে দিল সে। ঘাড় নেড়ে বলল, আচ্ছা। আবার সামনের মাসে...

গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়বার পর প্রদীপ শুধু একটা কথা ভাবছে। কল্পনা, না সত্যিই এসেছিল? দৃষ্টিবিভ্রম? তা কী করে হবে, অমন জীবন্ত, কথা পর্যন্ত বলেছে। সেই শরীরের ছবি সে এখনও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

জ্যাম শুরু হয়ে গেছে। গাড়ির গতি মন্থর। অফিসের কাজে দেরি হবার কথা প্রদীপের মাঝে মাঝে মনে পড়লেও আবার ইচ্ছে করছে গাড়ি ঘুরিয়ে উষসীর কাছে ফিরে যেতে।

সারা দিন কাজের পর হোটেলের ঘরে ফিরে এসে প্রদীপ টি ভি চালিয়ে দিল। তার ভুরু কোঁচকানো। সামনে অনেকখানি সন্ধে ও রাত পড়ে আছে, সে একা একা কী করবে? দু'একটা প্রশ্নই তার মনে পাক খেতে থাকবে। কেন ও ভাবে এসেছিল উষসী? কালো চাদরটা তার গা থেকে হঠাৎ খুলে পড়ে গিয়েছিল, নাকি সে ইচ্ছে করে ফেলে দিয়েছিল? চাদরের তলায় তার শরীর প্রায় নগ্ন, এই অবস্থায় মেয়েরা চাদরের আচ্ছাদন খসে পড়তে দেয় না। দৈবাৎ খসে পড়লেও সঙ্গে সঙ্গে তুলে নেয়। তা তো নেয়নি উষসী, একটু দেরি করেছিল, তার মুখে লজ্জা পাবার কোনও আভাসও ছিল না। সে দেখাতেই চেয়েছিল, ঠোঁটের হাসিটাই তার প্রমাণ।

কেন শুধু শুধু দেখাবে? উষসীর সঙ্গে তেমন কোনও ঘনিষ্ঠতা কখনও হয়নি প্রদীপের। অন্য অনেকের মতন সেও উষসীর রূপে মুগ্ধ, অমন রূপ দেখে মুগ্ধ হবে না যে পুরুষ, সে তো অন্ধ। কিন্তু প্রদীপ তো কোনও দিন ওর দিকে হাত বাড়াবার কথা ভাবেনি। বিবাহিত জীবনে সে অন্য কোনও নারীর সঙ্গে সীমা লঙ্ঘন করে ঘনিষ্ঠ হয়নি। কুহুর অজান্তেও নয়।

উষসী কেন হঠাৎ এ রকম একটা অন্তরঙ্গ ছবি তুলে ধরল তার চোখের সামনে। শুধু শরীর নয়, তার একটা ভাষা আছে। সেই ভাষার মর্ম কিছুতেই বুঝতে পারছে না প্রদীপ।

যদি পুরোপুরি কল্পনাই হয়, তা হলে সে কি কখনও উষসীর শরীর ওই ভাবে দেখতে চেয়েছিল? সচেতন ভাবে তো নয়, অবচেতনে কি হতে পারে? সাবকনসাস ব্যাপারটা খুব গোলমেলে। মনের গভীরে কী ঘটছে, তা মানুষ নিজেই জানে না। সে তো উষসীকে নিয়ে বিরলে কখনও চিন্তামগ্ন হয়নি। কখনও ফ্যানটাসি রচনা করেনি। নারী শরীর নিয়ে আগ্রহই তার কমে গিয়েছিল কিছু দিন ধরে। কুহুর মিসক্যারেজ হবার পর সে অনেক দিন কুহুর সঙ্গে উপগত হয়নি, বিবাহিত জীবনের মধ্য গগনে ও সব নাকি আস্তে আস্তে কমে যায়। প্রেম কিংবা কামের জায়গা নেয় খানিকটা স্নেহ, বন্ধুত্ব, পারস্পরিক বোঝাবুঝি। এ সবের জন্যই বিবাহিত জীবন স্বাভাবিক থাকে, নইলে তিক্ততা এসে পড়ে। কুহুর সঙ্গে সেই তিক্ততা আসেনি।

কিন্তু উষসীর ওই রূপ দেখে তার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠেছে। যখনই সে মনে মনে সেই দৃশ্যটা ভাবছে, অমনি উত্তেজিত হয়ে উঠছে শরীর। যদিও অন্য কোনও বিবাহিত রমণীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার মতন মানসিকতা নয় প্রদীপের। একটা আলাদা গোপন জীবন, সে বড় ঝঞ্ঝাটের। কুহুকে সে দুঃখ দিতেও চায় না।

না, উষসীর কাছে নিজে থেকে আর কখনও যাবে না প্রদীপ।

এটা মনে মনে ঠিক করে ফেলার পরও উষসীর কথাই চিন্তা করতে লাগল সে। চিন্তাটাকে সে কী করে দমন করবে? টি ভি'র কোনও প্রোগ্রামই তার মন টানতে পারছে না। তার একটাই প্রশ্ন, উষসী অমন প্রলোভন দেখিয়েও কেন তার কাছে এলো না? এটা কি তার একটা খেলা?

কয়েক বারই সে ভাবল, উবসীকে সে ফোন করবে। সামনাসামনি যা জিজ্ঞেস করা যায়নি, তা ফোনে বলা যেতে পারে।

তবু সে ফোন করল না। প্রতীক্ষা করতে লাগল। যদি উবসী নিজে ফোন করে। একবারও বাজল না তার ফোন।

প্রদীপ আর ঘর থেকে বেরোলোই না, কিছু খেল না, এক সময় সে চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়ল। গত রাত্রির অনিদ্রা শোধ তুলে নিচ্ছে।

পরের সপ্তাহেই একটা সামান্য কাজের ছুতো নিয়ে প্রদীপ আবার এল সান ফ্রান্সিসকোতে। উঠল একই হোটেলে।

চেক ইন করার পর নিজের রুমে গিয়ে প্রদীপের প্রথম কাজই হল টেলিফোন করা।

উবসী বলল, প্রদীপ? হাউ নাইস অফ ইউ টু রিমেমবার মি। ওদিককার কী খবর? ওয়েদার রিপোর্টে দেখলাম, ইস্ট কোস্টে দু'দিন ধরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। এখানে টানা এক সপ্তাহ উই আর হ্যাভিং লাভলি ওয়েদার।

প্রদীপ বলল, নিউ জার্সি থেকে বলছি না, আমি এখন সান ফ্রান্সিসকোতে। একটু আগে এসে পৌঁছেছি।

উবসী বলল, তাই? তুমি এখানে? এত তাড়াতাড়ি এলে? খুব জরুরি কাজ পড়েছে বুঝি?

প্রদীপ চট করে মিথ্যে কথা বলে না। সে বলল, না, কাজটা খুব সামান্যই। না এলেও চলত। তবু চলে এলাম।

উবসী বলল, বাঃ! কী করছ আজ সন্ধেবেলা? সন্ধের পর নিশ্চয়ই অফিসের কাজ থাকে না। চলে এসো।

যাব? তুমি ফ্রি আছ?

অ্যাবসলিউটলি ফ্রি। সারা দিন তো কিছুই করার নেই। আর রণজয়ও বোধহয় আজ দেরি করে ফিরবে।

আমি যদি প্রত্যেক সপ্তাহেই এখানে আসি আর তোমাদের বাড়িতে খেতে যাই, সেটা কেমন যেন দেখাবে না? বরং তুমি যদি ফ্রি থাকো, এখানে চলে আসতে পারো, কিংবা আমিও তোমাকে পিক আপ করে নিতে পারি। তার পর কোনও রেস্তোরাঁয় বসে।

রেস্তোরাঁর চেয়ে বাড়িই আমার ভাল লাগে। অধিকাংশ রেস্তোরাঁতেই এমন গোলমাল হয় যে কথা বলা যায় না। আর খাওয়ার কথা বলছ? নিজেদের জন্য কি আমি রান্না করি না? তাতে তুমি এমন কী ভাগ বসাবে? অবশ্য বাড়ির রান্না যদি তোমার পছন্দ না হয়...

গত সপ্তাহে তোমাদের বাড়িতে যা খেয়েছি, প্রত্যেকটা পদ খুব চমৎকার। আমি মাছ খুব ভালবাসি। তবু তোমার কাছে যেতে আমার একটু ভয় ভয় করছে।

ভয়?

হ্যাঁ, ভয়।

কীসের ভয়?

ফ্র্যাংকলি বলব?

অফ কোর্স!

উবসী, সে দিন আমি শুয়ে পড়ার পর কি তুমি গেস্ট রুমে একবার এসেছিলে?

এসেছিলাম তো। তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না খোঁজ নিতে। তোমার সঙ্গে দু'একটা কথাও তো হল। কেন জিজ্ঞেস করছ?

সে রাতে আমি তোমার যে রূপ দেখে ফেলেছিলাম

রূপ? প্রদীপ, বিউটি ইজ স্কিন ডিপ। পুরুষরা কি মেয়েদের শুধু রূপটাই দেখে? রূপ কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি পুরনো হয়ে যায়। ভেতরের মানুষটাকে না জানলে তো কিছুই জানা হয় না।

ভেতরের মানুষটাকে জানতে সময় লাগে। এক দিন দু'দিনে হয় না। কিন্তু সে সময় আমাদের কোথায়? বিশেষত এ দেশে তো আমাদের সময়ই নেই।

আমার মতন হাউজ ওয়াইফদের অফুরন্ত সময়। আর যাদের বাচ্চাকাচ্চা থাকে না, তারা তো দারুণ লোনলি! প্রদীপ, তুমিও বিবাহিত, আমিও বিবাহিত, তবু আমাদের কি বন্ধুত্ব হতে পারে না?

তুমি আমার বন্ধু হতে চাও, উবসী?

হ্যাঁ চাই।

কিন্তু তোমার আমার বয়েসি দু'জন নারী পুরুষের মধ্যে কি সঠিক বন্ধুত্ব হতে পারে? তার মধ্যে কি অন্য রকম ডিজায়ার, আই মিন ফিজিক্যাল অ্যাট্রাকশান এসে পড়তে পারে না?

যদি বা দু'একবার এসেই পড়ে, তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? মহাভারতের মুনি-ঋষিরাও তো... প্রদীপ, আমিও তোমাকে একটা কথা খুব ফ্র্যাংকলি জিজ্ঞেস করতে পারি? তুমি কিছু মনে করবে না?

না, উবসী, বলো।

তুমি আমাকে একটা সন্তান দেবে?

কী বললে?

আমি তোমার কাছ থেকে, আই ওয়ান্ট আ চাইল্ড। তোমার কাছ থেকেই, কারণ অন্য পুরুষদের চেয়ে তোমার পৌরুষ বেশি। তুমি একসঙ্গে দুটি ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়েছ।

প্রদীপ বলল, এক মিনিট, এক মিনিট ধরো।

আজকাল এ দেশের প্রায় সব হোটেলেই নন স্মোকিং, এখানে এই হোটেলের একটা ফ্লোরের ঘরে সিগারেট খাওয়া যায়। উত্তেজনায় প্রদীপ কাঁপছে, এখন একটা সিগারেট না ধরালে চলে না।

আবার রিসিভার তুলে সে বলল, উবসী, তুমি যা বললে, সেটা ঠিক নয়। টুইনের জন্ম দেবার জন্য পৌরুষ লাগে না। এটা ক্রোমোজোমের খামখেয়াল। তুমি যা চাও, তা অন্য কোনও পুরুষও...

উবসী বলল, আমি আগে কখনও এ কথা ভাবিনি। তোমাকে দেখেই প্রথম মনে হয়েছে। শোনো, তুমিও তোমার সংসার ভাঙবে না, আমিও আমার সংসার ভাঙব না। সে রকম কোনও ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্টও আমাদের মধ্যে থাকবে না। শুধু যদি আমরা, আই মিন, অফ কোর্স আমাকে যদি তোমার ডিজায়ারেবল মনে হয়

তোমার মতন ডিজায়ারেবল রমণী আমি আগে একজনও দেখিনি। বিশেষত সেই রাতে।

তোমার বুকের মধ্যে আমাকে নেবে? জানি না, তোমার কোনও মরাল কোয়ালমস্ আছে কি না। কেউ কিছু জানতে পারবে না।

মরালিটি? অন্য কারওকে যদি দুঃখ দিতে না হয়।

তুমি আসবে?

কবে?

আজই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

আমি এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ছি।

এসো, প্রদীপ। আমি একেবারে একা। তোমার বুকে মাথা রাখব।

লিফ্ট আসতে দেরি করছে, ধৈর্য ধরতে না পেরে প্রদীপ দৌড়ে দৌড়ে নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে।

গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করে স্টার্ট দেবার পরও সে সিট বেল্ট বাঁধতে ভুলে গেল, পিক পিক শব্দ করতে লাগল একটা লাল আলো।

এত তাড়াহুড়োর মধ্যেও প্রদীপ একটা ব্যাগে এক প্রস্থ পোশাক আর স্লিপিং সুট ভরে এনেছে।

রাস্তা চেনার কোনও অসুবিধে নেই। পথ নির্দেশিকা লাগানো আছে গাড়িতে। গন্তব্য শহরের নাম, রাস্তার নাম আর বাড়ির নম্বর টিপে দিলেই একটা ম্যাপ ফুটে উঠবে। একটা নারীকণ্ঠ মিষ্টি করে বলবে। এ বার ডাইনে যাও, তার পর সোজা আট মাইল, একজিট নাম্বার টুয়েন্টি ফোর নাও ... যদি ভুল করে ডান দিকের বদলে বাঁ দিক ঘুরলেও ক্ষতি নেই, আবার সেই কণ্ঠস্বর বলবে, আই অ্যাম ক্যালকুলেটিং, ফুটে উঠবে নতুন ম্যাপ, নিয়ে যাবে ঠিক রাস্তায়। সবটাই মনে হয় ম্যাজিকের মতন। ঠিক যেন একটি মেয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে গাড়ির ইঞ্জিনের মধ্যে, সে দুনিয়ার সব পথঘাট নিখুঁত ভাবে চেনে। আসলে নির্দেশ আসছে ওপরের এক স্যাটেলাইট থেকে। এমনকী, পৌঁছোতে কত সময় লাগবে, বলে দেবে দাও।

আর কোনও অস্পষ্টতা নেই।

উবসী নিজে বলেছে, সে প্রদীপের বুকে মাথা রাখতে চায়, আর কোনও পুরুষ নয়, প্রদীপের কাছ থেকেই একটি সন্তান চায়।

কোনও পুরুষের পক্ষে এই ডাক উপেক্ষা করা সম্ভব? বিশেষত উবসীর মতন এক অগ্নি-শিখা রমণীর আহ্বান। এই মধ্য যৌবনেই প্রদীপের শারীরিক ভোগ-বাসনা খানিকটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল, এক বিছানায় শুয়েও কুহুর সঙ্গে সেই সম্পর্ক আর ছিল না। এখন আবার প্রদীপের মনের মধ্যে এক ঝোড়ো হাওয়া এসে প্রতিটি রোমকূপে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে, এখন কোনও নৈতিকতা বোধেই তা বাধা মানবে না।

কেউ কিছু জানবে না, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে উবসী।

গাড়ির গতি শ্লথ হয়ে গেল, সামনে জ্যাম। উঃ, এই দেশটায় গাড়ি

চালাবার এই এক বিষম জ্বালা। কখন কোথায় জ্যাম হবে, তার ঠিক নেই, সিক্স লেন রাস্তা, তবু জ্যাম। এমনকী রাতদুপুরেও জ্যামের বিরাম নেই।

উষসী একা বসে আছে।

অস্থির অস্থির লাগছে প্রদীপের। জ্যামে পড়লে শূন্য দিয়ে উড়ে যাবার তো উপায় নেই। আরও দেরি হলে উষসীকে ফোনে জানিয়ে দিতে হবে।

আবার গাড়ি চলতে শুরু করার একটু পরেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড শুরু হল। প্রদীপের মনে হল, সমস্ত আকাশটা প্রবল বেগে ঘুরছে, তার পর দুলতে লাগল গাড়িটা। এমনই জোরে ঘুরছে যে স্টিয়ারিং-এ কন্ট্রোল রাখতে পারছে না। পেছনের গাড়িটা হর্ন বাজাল।

ব্যাপারটা বুঝতে একটুখানি সময় লাগল প্রদীপের।

আকাশ ঘুরছে না, গাড়িটাও দুলছে না, মাথা ঘুরছে প্রদীপের। সে গাড়িটাকে সামলাতে পারছে না, যে-কোনও মুহূর্তে অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে।

সে অতি কষ্টে গাড়িটাকে রাস্তার ধারের শোলডারে এনে দাঁড় করাল। এখনও রাস্তাটা উঁচু নিচু হচ্ছে অনবরত, মাথার সঙ্গে সঙ্গে তোলপাড় হল প্রদীপের বুক।

এটা কী হচ্ছে? হার্ট অ্যাটাক? সেরিব্রাল অ্যাটাক? কোনটার আগে কী হয়, তাও প্রদীপ জানে না। সে কি মরে যাচ্ছে? গাড়ির অ্যাক্সিডেন্টেও শেষ হয়ে যেতে পারত।

কিছুতেই মাথাঘোরা থামছে না।

প্রদীপের এক ডাক্তার বন্ধু একদিন বলছিল, যদি হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হয়, চেস্ট পেন কিংবা কপালে অকারণে ঘাম ফুটে ওঠে, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে দুটো অ্যাসপিরিন জাতীয় ট্যাবলেট খেয়ে নিলে তখনকার মতন আটকানো যায়।

প্রদীপ অতিকষ্টে গ্লাভ বক্স খুলে একটা টাইলেনলের শিশি বার করল। তার মাঝে মাঝে মাথা ধরে কিংবা ক্লান্তি লাগে, তাই সে সব সময় টাইলেনল সঙ্গে রাখে। গাড়িতে জলের বোতলও রাখে সবাই, প্রদীপ দুটো ট্যাবলেট খেয়ে নিল, মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিল স্টিয়ারিং-এর ওপর।

মৃত্যুভয় তাকে পেয়ে বসেছে।

ফ্রয়েড বলেছেন, জীবনে তিনটি ব্যাপারই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বেঁচে থাকার লড়াই, কাম প্রবৃত্তি, যা আসলে নিজ প্রজাতির বংশ-বৃদ্ধির তাড়না, আর মৃত্যুভয়। থ্যানাটোফোবিয়া।

প্রথম দুটিই প্রদীপ অনুভব করেছে এত দিন, আজই প্রথম অনুভব করল তৃতীয়টি, থ্যানাটোফোবিয়া। মাঝে মাঝে তার মনে পড়তে লাগল কুহুর কথা, তার ছেলে আর মেয়ের মুখ। সে এই হাইওয়ের ওপর মরে পড়ে থাকবে, ওরা কেউ জানতেও পারবে না?

বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া শোলডারের ওপর বেশিক্ষণ গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখাও বে-আইনি। অনতিবিলম্বে একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামল তার গাড়ির পেছনে।

একজন পুলিশ অফিসার নেমে এসে টোকা দিল তার জানলায়।

প্রদীপ মাথা তুলে পুলিশকে দেখে নামিয়ে দিল কাচ।

অফিসারটি জিজ্ঞেস করল, এনি প্রবলেম?

প্রদীপ বলল, আই অ্যাম ফিলিং ডিজি, তাই আমি একটু বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছি।

অফিসারটি বলল, হাসপাতালে যেতে হবে? আমি সাহায্য করতে পারি।

প্রদীপ বলল, না, তার দরকার হবে না মনে হয়।

অফিসারটি অনুরোধের সুরে বলল, আপনি কি গাড়ি থেকে একবার নেমে দাঁড়াতে পারবেন?

এই অনুরোধের কারণটা স্পষ্ট।

প্রদীপ বলল, অফিসার, প্লিজ বিশ্বাস করুন, আমি আজ এক ফোঁটাও অ্যালকোহল স্পর্শ করিনি, কোনও রকম ড্রাগও নিই না। আমি একজন নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট।

অফিসারটি এ সব কথা গ্রাহ্য না করে বলল, অনুগ্রহ করে আপনার চশমাটা খুলবেন কি? তার পর আমার দিকে তাকান।

প্রদীপের চশমা খোলা চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে অফিসারটি বলল, ঠিক আছে। আমি আপনার পেছনেই অপেক্ষা করছি। দশ মিনিটের মধ্যেও যদি আপনি ভাল ফিল না করেন, তা হলে আমি অ্যামবুলেন্স ডাকব।

প্রদীপের মাথাঘোরা থেমে গেছে এর মধ্যে। তা ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় না পুলিশটির সঙ্গে কথা বলার জন্য, তা বলা যায় না।

সে এক বার গা-ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসল। হ্যাঁ। সে এখন গাড়ি চালাতে পারবে। আর দেরি করলে পুলিশটি জোর করেই তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে।

গাড়ির গতি বাড়াবার আগে প্রদীপ একবার ভাবল, তার কি এখন হোটেলে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়া উচিত? কিংবা কোনও ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া?

ও দিকে উষসী তার প্রতীক্ষায় বসে আছে। সেই মুখটা মনে পড়তেই প্রদীপ আবার ভাবল, দুর, যদি মরতেও হয়, তার আগে অন্তত একবার—

সে গাড়ি ঘোরাল না।

পুলিশের গাড়িটি একটুক্ষণ তার পিছু পিছু এসে তার পর মিলিয়ে গেল অন্য দিকে।

এর পর আর জ্যাম নেই। সহজ রাস্তা। প্রদীপের মস্তিষ্কে জড়তাও নেই।

উষসীদের বাড়ির সামনে এসে প্রদীপ হকচকিয়ে গেল। ড্রাইভ ওয়েতে আরও দু'খানা গাড়ি দাঁড়িয়ে।

দরজা খুলে দিল রণজয়। প্রদীপকে দেখে সে কিছুটা বিস্মিত হলেও তা মুছে ফেলে উৎফুল্ল ভাবে বলল, এসো, এসো—

ভেতরে অনেক লোকজন। দুটি দম্পতি ও তাদের তিনটি ছেলেমেয়ে। রণজয় আলাপ করিয়ে দিল, একজন রণজয়ের ব্যবসায়ের অংশীদার কার্ল, অন্যজন তাদের বন্ধু এক সায়েন্টিস্ট, তার নামটা প্রদীপের মনে রইল না।

উষসী পরে আছে একটা কালো রঙের জিনস, তার ওপরে একটা কালো রঙেরই সিল্কের লো কাট ব্লাউজ। সে হাসিমুখে বলল, এসো, এসো প্রদীপ, জয়েন আওয়ার ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস।

বাইরের ডেকে বারবিকিউ হচ্ছে। সেই সঙ্গে চলছে মদ্যপান। প্রদীপের হাতেও একটা গেলাশ ধরিয়ে দেওয়া হল।

এক পাশে আড়ষ্ট ভাবে বসে রইল প্রদীপ। মাঝে মাঝে কথাবার্তায় যোগ দিতেই হয়। সবই অর্থহীন আমড়াগাছি। আবহাওয়ার কথা, ব্যবসার কথা, হিলারি ক্লিনটনের প্রেসিডেন্ট হবার সম্ভাবনার কথা।

উষসী ভেতরে কথা বলছে অন্য দুই মহিলার সঙ্গে আর বাচ্চাদের এটা ওটা খাবার দিচ্ছে। দু'একবার আসছে বাইরের ডেকে, প্রদীপকে এক বার জিজ্ঞেস করল, তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

উষসীর সঙ্গে আলাদা ভাবে কথা বলার কোনও সুযোগ নেই, সে রকম কোনও চেষ্টাও করছে না সে। বার দুয়েক চোখাচোখিও হল প্রদীপের সঙ্গে, তার দৃষ্টি একেবারে পরিষ্কার, তাতে কোনও গুপ্ত ইঙ্গিত নেই।

ডিনার সার্ভ করা হল ঠিক সাড়ে ন'টায়। আশ্চর্য, আজ রণজয় এখনও আউট হয়নি। দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে। হাসিঠাট্টাও চলছে অনবরত।

ডিনারের পর সে আবার কনিয়াক পানের প্রস্তাব দিল।

প্রদীপ তাতে যোগ দিতে চায় না। তাকে উঠতে হবে, কাল সকালেই তার জরুরি কাজ আছে।

আজ ঝড়-বৃষ্টি নেই, গ্লোরিয়াস ওয়েদার যাকে বলে, সুতরাং তার রাত্তিরে থেকে যাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সে অনুরোধও জানালো না কেউ।

সবার কাছ থেকে বিনীত ভাবে বিদায় নিল সে। একটু দূর থেকেই উষসী বলল, আবার এখানে এলে খবর দিও।

গাড়ি চালাবার সময় সর্বক্ষণ ভুরু কুঁচকে রইল প্রদীপের।

কী ব্যাপারটা হল? উষসী বলেছিল, সে প্রদীপের বুকে মাথা রাখতে চায়। সে একা আছে। অথচ বাড়িতে এত লোক! ওরা হঠাৎ এসে পড়েছে? বিনা আমন্ত্রণে কিংবা সে দিনই ডাকলে আমেরিকানরা তো সপরিবার কোনও বাড়িতে ডিনার খেতে যায় না। এটা তাদের ধর্মে নেই।

আগে থেকেই রণজয় ওদের এ দিন নেমন্তন্ন করে রেখেছিল? কিন্তু বাড়ির গৃহিণী জানবে না, তা কি হয়! উষসী ভুলে গিয়েছিল? তা হলে এতগুলি লোকের জন্য রান্না, সব ব্যবস্থা করে রাখা, তা কি অল্প সময়ে সম্ভব?

কোনও উত্তরই খুঁজে পাচ্ছে না প্রদীপ। শেষ কালে উষসী বলল, আবার এলে খবর দিও। অর্থাৎ এ বারে সে রবাহূত হয়ে এসেছে!

তবু প্রদীপ ঠিক করল, সামনের সপ্তাহেই তাকে আবার আসতে হবে!

॥ ৫ ॥

স্বাধীনতার উষ্ণ মধুর বাতাস

কুহু ঠিক করেছিল, সে প্রথম দু'তিন দিন শুধু শুয়ে-বসে কাটাবে। কোথাও যাবে না, কারও সঙ্গে দেখাই করবে না, বেরুবেই না ঘর থেকে। বহুক্ষণ ধরে একটানা বই পড়ার আনন্দ সে পায়নি অনেক দিন।

কিন্তু কুহুর স্বভাবটাই যে ছটফটে। জাগ্রত অবস্থায় সে সিনেমা-থিয়েটারের সিট ছাড়া পাঁচ-দশ মিনিটের বেশি এক জায়গায় বসে থাকতেই পারে না। শুয়ে থাকাও অসম্ভব। তার ঘুমও কম।

প্রথম দিনেই সে অনেক দিন অব্যবহৃত ফ্ল্যাটটি নতুন করে গুছিয়ে ফেলল। চতুর্দিকে ছড়ানো ছিল জিনিসপত্র।

দু'চার দিনেই তো একটা বাড়ি কিনে ফেলা যায় না, অনেক দেখতে হয়। ভাড়া নেবার মতন কোনও ফ্ল্যাটই তার পছন্দ হয়নি। অগত্যা সে অনীশের ফ্ল্যাটেই উঠেছে। খালিই পড়ে আছে কয়েক মাস। কুহু ঠিক করে রেখেছে সে কাকামণির নামে প্রতি মাসে কিছু ভাড়ার টাকা জমা করে রাখবে।

পাড়াটা খুব ভাল, নিরিবিলি। আপস্টেট নিউ ইয়র্কের হোয়াইট প্লেস। মূলত শ্বেতাঙ্গদের, কালো মানুষ কিছু আছে, তবে তারা পয়সাওয়ালা, সাদা-কালো কোনও গরিবেরই এখানে স্থান নেই। আমেরিকানদের চোখে ভারতীয়রাও কালো, কিন্তু ভারতীয়রা নিজেদের কালোদের দলে বলে মনে করে না। শ্বেতাঙ্গদের দৃষ্টিশক্তিতে সাদা আর কালোর মাঝখানে কোনও শেডই ধরা পড়ে না, কাশ্মীরিদের মতন ফর্সা কিংবা জাপানিরাও কালো বলেই গণ্য। কিছু অবস্থাপন্ন ভারতীয়ও থাকে এখানে।

এই ফ্ল্যাট বাড়িটা খুব বেশি উঁচু নয়, বারো তলা। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিখুঁত। সামনে প্রহরী থাকে চব্বিশ ঘন্টা। কোড নাম্বার জানা না থাকলে ভেতরে যাবার দরজাই খুলবে না। তবু কি কোনও উটকো লোক ইচ্ছে করলে ঢুকে পড়তে পারে না ভেতরে? সিনেমায় দেখা যায়, কোনও আগন্তুক এসে অ্যাপার্টমেন্ট নাম্বারগুলিতে বোতাম টেপাটেপির ভান করে। এর মধ্যে অন্য কেউ এসে যখন কোড নাম্বার দিয়ে দরজা খোলে, তখন সেও চট করে পেছন পেছন ঢুকে যায়। অন্য ব্যক্তি তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

প্রথম দিনই বেরিয়ে প্রচুর গ্রসারি অর্থাৎ চাল-ডাল-মশলাপাতি আর মাছ-মাংস কিনে নিয়ে এল কুহু। মাঝে মাঝে বাইরে খাবে, নিজে রান্না করেও তো খেতে হবে।

পাতা হয়ে গেল তার নতুন সংসার। শুধু একার জন্য।

বারো তলার অ্যাপার্টমেন্ট সংলগ্ন রয়েছে একটি লম্বা টানা বারান্দা। এ রকম বারান্দা এ দেশে দুর্লভ। সেখানে একটি চেয়ার পেতে বসলে চোখ চলে যায় বহু দূরে, সূর্যাস্তও দেখা যায়। এ দিকটাও খুব সবুজ।

এত প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা একটা মহাদেশ কত কাল খালি পড়ে ছিল! না, খালি পড়েছিল না মোটেই, আদিবাসী মানুষ ছিল, তাদের মেরে ধরে খুন করে প্রায় নিঃশেষ করে ফেলে সব কিছু দখল করে নিয়েছে শ্বেতাঙ্গরা।

সব ভাল, শুধু একটাই অসুবিধে, এখানকার ফোন নাম্বার অনেকেই জানে। মা-বাবা কিংবা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা তো বলতেই হবে কিন্তু আর কেউ যেন বিরক্ত না করে।

দুপুরেই বেরিয়ে পড়ল কুহু।

এই অঞ্চলটা কুহুর মোটামুটি চেনা। বিয়ের আগে সে এখানে মাঝে মাঝে কাকা-কাকিমার সঙ্গে সপ্তাহান্ত কাটিয়ে গেছে।

গাড়ি আছে, তবু পায়ে হেঁটেই কুহু চলল স্টেশনের দিকে। ম্যানহাটান ঘুরে আসবে, ওখানে গাড়ি নিয়ে গেলে পার্কিং-এর জায়গা খুঁজতেই ধৈর্য হারিয়ে যাবে। আর পার্কিং লটে ঢোকালেই এক গাদা খরচ। ট্রেন অনেক ভাল।

কত দিন পর কুহু ট্রেনে চাপবে। কোথায় যাবে? ঠিক নেই। এ রকম উদ্দেশ্যহীন ভাবে বেরিয়ে পড়ার নামই তো স্বাধীনতা।

নিউ জার্সি থেকে নিউ ইয়র্কে আসতে গেলে নদী পেরুতে হয়। হাডসন নদীর তলা দিয়ে হলান্ড টানেল কিংবা লিন্‌কন টানেল, কিংবা ওয়াশিংটন ব্রিজ। জনসংখ্যা আর গাড়ির সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, তাই এ সব পারাপারের জায়গায় প্রতিদিন জ্যাম থাকে। ব্রডওয়েতে থিয়েটার দেখতে হলে অন্তত দু'ঘন্টা আগে বেরুতে হয়। এক বার কুহু আর প্রদীপ একটা নাটক দেখতে এসে আধ ঘন্টা পরে পৌঁছেছিল। ভেতরে আর ঢুকতেই দেয়নি।

এখানে আর নদী পেরুনোর সেই ঝামেলা নেই। মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পৌঁছে যাওয়া যায় গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশনে।

এখানে আগে যে দু'তিন বার এসেছে কুহু, প্রত্যেকবারই তার মনে হয়েছে, এই ম্যানহাটনই যেন প্রকৃত আমেরিকা। অন্য ছোট ছোট শহরগুলি দেখলে সেটা ঠিক বোঝা যায় না।

সিঁড়ি দিয়ে হুড় হুড় করে নেমে আসে হাজার হাজার মানুষ। সাদা, কালো, খয়েরি, হলুদ, কত রকম মানুষ, আর কত বিচিত্র পোশাক। সুট-টাই পরার প্রথা ভেঙে দিয়েছে হিপিরা, এখন যার যা ইচ্ছে পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায়, কেউ তাকিয়েও দেখে না। আলখাল্লা পরা আরবের পাশে, পাজামা-কুর্তা পরা ভারতীয় বা পাকিস্তানি বা বাংলাদেশি, শোনা যায় নানান রকমের ভাষা। আমেরিকা দেশটাকে এক সময় বলা হত, নানান জাতের মানুষের মেল্টিং পট, এখন বলা হয় স্যালাড বোল।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে কুহুর হঠাৎ ইচ্ছে হল একটা সিগারেট খেতে। বিয়ের পর কিছু দিন সে প্রদীপের দেখাদেখি নিজেও সিগারেট খেয়েছে, বাচ্চা হবার পর একেবারে ছেড়ে দেয়। প্রদীপকেও সে বাড়ির মধ্যে খেতে দেয়নি।

এক প্যাকেট সিগারেট ও লাইটার কিনে প্রথম সিগারেটটা ধরাবার পরই সে দেখতে পেল একটি চেনা মুখ।

নিউ ইয়র্কের মতন এত বড় শহরে পথেঘাটে কোনও পরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া খুবই অস্বাভাবিক। তবু দেখা হয়।

কুহু খুশির বিস্ময়ের সঙ্গে মনে মনে বলে উঠল, লিন্ডা?

লিন্ডা প্যাটারসন নামে এই মেয়েটি সিনসিনাটিতে সহপাঠিনী ছিল কুহুর। বেশ ভাব ছিল তার সঙ্গে।

লিন্ডাই প্রথম বলল, হাই কিউহু!

নামটা ঠিক মনে রেখেছে লিন্ডা, কিন্তু কিছুতেই সে কুহু উচ্চারণ করতে পারে না। অথচ কিউহু'র চেয়ে কুহু কি সহজ নয়?

লিন্ডা শ্বেতাঙ্গিনী নয়, আবার পুরোপুরি কালোও নয়, সে মুলাটো। মাজা মাজা রং, ঠোঁটও পুরু নয়, মুখশ্রী সুন্দর। ভারতে এই রকম চেহারার মেয়েদের বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।

হাতঘড়ি দেখে লিন্ডা বলল, ইস তোর সঙ্গে দেখা হল, কত গল্প করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে আমাকে ট্রেন ধরতে হবে। তুই এখন নিউ ইয়র্কে থাকিস?

কুহু বলল, ঠিক নিউ ইয়র্ক শহরে নয়, খানিকটা দূরে। তুই এখনও সিনসিনাটিতে আছিস?

লিন্ডা বলল, না। আমি এখন কাজ করছি ব্রুকলিনে। আমার মাকে নিয়ে এসেছি আমার কাছে। উই মাস্ট মিট সাম ডে। তোর ফোন নম্বার দে।

দুজনের মোবাইল ফোন নম্বর বিনিময়ের পর কুহু জিজ্ঞেস করল, তুই কি ফাইনালি বিয়ে করেছিস?

বেশ জোরে মাথা নেড়ে লিন্ডা বলল, নাঃ! বিয়ে করার প্রশ্নই ওঠে না। বাট আই হ্যাভ থ্রি লাভ্‌লি চিলড্রেন বাই নাউ। তুই আমার বাড়ি আয়, তাদের দেখবি। ছোটটার বয়েস তিন বছর, সো কিউট, দেখলেই তোর কোলে নিতে ইচ্ছে করবে। তোর ইন্ডিয়ান স্বামীটা, কী যেন নাম, দীপ, তাই না, তুই এখনও তাকে ভালবাসিস?

মুহূর্তেক ইতস্তত করে কুহু একটু হেসে বলল, হ্যাঁ, এখনও ভালবাসি।

লিন্ডা বলল, তোদের ভারতীয় বিয়ে, সে তো পবিত্র ব্যাপার। এ দেশে না থাকলে তুই, দীপ যদি আগে মরে, তুই সতী হতিস নিশ্চয়ই?

কুহু বলল, যাঃ, ও সব—

লিন্ডা বলল, এই রে, আমাকে দৌড়োতে হবে, এই ট্রেনটা মিস করা যাবে না। শিগগিরই আমরা মিট করব, তাই ঠিক রইল।

সত্যিই সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠে গেল লিন্ডা।

বিয়ে করেনি, তিনটি সন্তান। এ দেশে অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। চাকরি করতে কিংবা বাড়ি ভাড়া পেতে অসুবিধে হয় না কারওর।

কলেজে পড়ার সময়ই লিন্ডা প্রথমে গর্ভবতী হয়। কে তার গর্ভে বীর্য

নিষেক করেছে, তা সে কারওকে বলেনি। সেই সময়েই লিন্ডা ঘোষণা করে যে বিবাহ নামের ইনস্টিটিউশানে সে বিশ্বাস করে না। বিবাহ মানেই পুরুষের কাছে নারীর অধীনতা স্বীকার, সে জীবনে তা মানবে না। তবে, সে বাচ্চাদের ভালবাসে। পেটে যেটি এসেছে, সেটি তো সে নষ্ট করবেই না, ভবিষ্যতে আরও সন্তান চাইবে।

তখন লিন্ডার বয়েস ছিল সতেরো বছর, দারুণ তেজি মেয়ে। কুহুর মনে হয়েছিল, লিন্ডার ওই সব নারীবাদী ঘোষণা নিছক কথার কথা, বয়েস একটু বেশি হলে ওই সব শপথ আর মনে থাকে না। কিন্তু লিন্ডা তো এখনও সে রকমই আছে। চেহারাটাও ভালো রেখেছে, তিন সন্তানের জননী বলে বোঝাই যায় না।

কুহুর বিয়ের সময় লিন্ডা এসে খুব আমোদ করেছিল।

অনুষ্ঠান হয়েছিল রীতিমতন হিন্দু মতে। প্রদীপের বাবা-মায়ের সেই রকম ইচ্ছে ছিল, ওঁরা এসেছিলেন দেশ থেকে। কুহুদের বাড়ির দিক থেকে সে ব্যাপারে কোনও গরজ ছিল না, আপত্তিও ছিল না। একটি চার্চ সংলগ্ন হলে ব্যবস্থা হয়েছিল, রীতিমতন মন্ত্র পড়ে সাত পাকের বিয়ে। পুরুতও বাদ যায়নি, এক বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার শখের পুরুতগিরি করেন, রীতিমতন পৈতে পরে সংস্কৃত মন্ত্র বলেন খাঁটি উচ্চারণে। নারায়ণ শিলাও আছে তাঁর বাড়িতে।

স্থানীয় বাঙালি ক্লাব একটি নাটকের অভিনয়ের জন্য কিছু সরঞ্জাম আনিয়েছিল কলকাতা থেকে, তার মধ্যে ছিল বরের শোলার টোপর, আর কনের মুকুট, কাজে লেগে গেল সে দুটোও।

লিন্ডা মহা উৎসাহে ছবি তুলছিল আর তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছিল প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠানের মর্ম। দু'জনের মাথার ওপর একটা চাদর দিয়ে ঢেকে শুভদৃষ্টির সময় সে হেসে আকুল। বিয়ের দেড় বছর আগে থেকেই প্রদীপ ঘোরাঘুরি করেছে কুহুর সঙ্গে, কখনও লিন্ডার সঙ্গেও তাদের দেখা হয়েছে কোনও রেস্তোরাঁয়। অনেক আগে থেকেই যাকে চেনে, তার সঙ্গে নতুন করে দৃষ্টি বিনিময়?

কুহুর বিয়ের সময় লিন্ডা তাদের একটা বই উপহার দিয়েছিল, সেই সময়কার হৈ-চৈ ফেলা বই, নাওমি উল্ফ-এর লেখা 'দা বিউটি মিথ'। তখন কয়েক পাতার বেশি পড়া হয়নি, লিন্ডার সঙ্গে আবার দেখা হবার আগে পড়ে ফেলবে কুহু।

সিগারেটটা শেষ করেও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। লিন্ডার সঙ্গে দেখা হবার অনুষঙ্গে মনে পড়ে গেছে নিজের বিয়ের দিনগুলোর কথা। বিয়ে মানেই পুরুষের অধীনতা মেনে নেওয়া, তা অনেকটা সত্যি, কিন্তু তার জন্য শুধু পুরুষদেরই দায়ী করা যায়? স্বামী হিসেবে প্রদীপকে স্বৈরাচারী বলা যায় না, কুহুর ওপরে কর্তৃত্ব করতে চায়নি কখনও। দু'জনের সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতন। কিন্তু সন্তানের জন্মের পর কুহু অনুভব করেছিল, প্রকৃতিই মেয়েদের পরাধীন করে রেখেছে। সন্তানের নিরাপত্তার জন্যই সব মেয়েদের একজন পুরুষসঙ্গীর দরকার। জীবজন্তুর ক্ষেত্রে হয়তো সে দরকারটা কয়েক দিন বা কয়েক মাস বা বছরখানেক। আর মানুষ-নারীদের ক্ষেত্রে তা বেশ কয়েক বছর, বা সারা জীবন।

সন্তানের জন্ম দেবার ক্ষমতা পুরুষদের নেই, সন্তান পালনের জন্য যে সুদীর্ঘ সময় লাগে, তখনও পুরুষদের সে দায়িত্ব নেবার কোনও বাধ্যবাধকতা এই 'পুরুষ শাসিত সমাজই চালু করেনি। এ দেশে অবশ্য অনেক সাংসারিক কাজই নারী-পুরুষ সমান ভাবে ভাগ করে নেয়, কিন্তু সত্যিই কি সমান ভাগ হয়? সন্তানের জন্মের পর এ দেশের মায়েদেরও অনেক দিন ছুটি নিতে হয়, কেউ কেউ চাকরি ছাড়তেও বাধ্য হয়, বাড়িতে আটকা পড়ে যায়। পুরুষদের বাইরের জীবন অব্যাহতই থাকে।

একসঙ্গে যমজ বাচ্চাকে মানুষ করা কি সোজা কথা? হাসপাতাল থেকে ফেরার পর প্রথম কিছু দিন মা এসে ছিলেন কুহুর কাছে। তার পর ন্যানি রাখতে হয়েছিল, চাকরি ছাড়তেও বাধ্য হয়েছিল কুহু। প্রদীপ বিজ্ঞানী মানুষ, বিজ্ঞানের সার কথাটা হল প্রতিটি নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার আগে বহু বার বাস্তব পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে নিতে হয়, অথচ প্রদীপের বাস্তব জ্ঞান খুবই কম। বাচ্চাদের কাছে পাঁচ-দশ মিনিটও তাকে বসিয়ে কোথাও যাবার উপায় ছিল না। একটা বাচ্চা একটু কেঁদে উঠলেই প্রদীপ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠত, এই কুহু, শিগগির এসো, কী যেন হয়েছে! বাচ্চারা হিসি করে ফেললে ডায়াপার বদলাবে প্রদীপ? তা হলেই হয়েছে, আট-ন' মাসের আগে কোনও সন্তানকেই কোলে নিতে ভয় পেয়েছে সে, তার হাত থেকে যদি পড়ে যায়!

দেড় বছর বয়েসের পর ছেলেমেয়ে দুটি যখন আধো আধো কথা বলতে শিখেছে, দাঁড়াতে পারে, তখনই তাদের সঙ্গে খেলা করার জন্য কিছুটা সময় দিয়েছে প্রদীপ।

মাতৃস্নেহ একটা ইন্সটিংক্ট, কুহু তা জানে। সন্তান পালনের জন্য মায়েদের অনেক স্বার্থত্যাগ করতেই হয়, তারা বাধ্য, প্রকৃতিই সে ব্যবস্থা করে রেখেছে। পুরুষদের সে ইন্সটিংক্ট কি একেবারেই থাকে না? অনেক পরিবারে দেখা যায়, বাবারাও খুব নেটিপেটি হয়, ছেলেমেয়েদের নিয়ে আদিখ্যেতা করে। এ দেশেও কিছু কিছু পুরুষ বাচ্চাদের গু-মুত পরিষ্কার করতেও শিখে নেয়। অর্থাৎ সব পুরুষ সমান হয় না। ছেলেমেয়ের প্রতি প্রদীপের দুর্বলতা আছে ঠিকই, কুহু তা বোঝে, কিন্তু সে খানিকটা দূরত্বও রাখে।

ট্রেনে আসার সময় অন্য কারওর ফেলে যাওয়া নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকা পড়ে কুহু দেখছিল, আজ এ শহরে কোথায় কী অনুষ্ঠান আছে। তার মধ্যে একটা তার বেশ পছন্দ হয়েছিল। বার্নস অ্যান্ড নোবেল্‌সে এরিকা জঙ্গ-এর কবিতাপাঠ ও সাক্ষাৎকার। এই লেখিকাকে কুহুর খুব পছন্দ ছিল এক সময়। কোনও দিন সামনাসামনি দেখেনি। এরিকা জঙ্গ কবিতাও লেখে নাকি?

তার আগে কুহু ভেবেছিল, অ্যাঞ্জেলিকায় গিয়ে কোনও একটা সিনেমা দেখবে। অ্যাঞ্জেলিকার মতন কয়েকটি হলে খুব বাছাবাছা বিদেশি সিনেমা দেখা যায়, নিউ ইয়র্কের মতন এই সুযোগ-সুবিধে ছোট ছোট শহরগুলোতে নেই।

এখন তো হলে যাওয়াই হয় না সিনেমা দেখতে, বাড়িতে বসে ডি ভি ডি দেখা। খুব সাম্প্রতিক ফিল্মের তো ডি ভি ডি হয় না, একটু পুরনো ছবিই দেখতে হয়। অ্যাঞ্জেলিকায় একটা ফরাসি ছবি চলছে, এক কালের বিখ্যাত গায়িকা এডিথ পিয়াফের জীবনী অবলম্বনে, সেটা দেখাই কুহুর ইচ্ছে। কলেজে সে ফরাসি শিখেছিল, সেটা একটু ঝালিয়ে নেওয়াও হবে।

অবশ্য সিনেমাটা দেখেও এরিকা জঙ্গের অনুষ্ঠানে যাওয়া যেতে পারে, সেটা সাড়ে ছ'টায় শুরু। আজ অনেক কিছু করবে কুহু, বাড়ি ফেরার তাড়া নেই, রাত্তিরের দিকে একা একা একটা বারে গিয়ে বসবে। আজ সে শাড়ি পরে এসেছে, শাড়ি-পরা মেয়ে একা, বারে বসা, কেউ দেখেনি আগে।

কুহু ভেবেছিল, এরিকা জঙ্গের অনুষ্ঠানে এত বেশি ভিড় হবে যে সে বসার জায়গাই পাবে না। তাই সে একটু আগে আগে এসে পৌঁছেছে, কিন্তু কই, তত লোকজন তো নেই। এই হচ্ছে আমেরিকা, হুজুগের দেশ। বছর দশেক আগেও এরিকা জঙ্গের নামে জনতা, বিশেষত মেয়েরা উত্তাল হয়ে উঠত, এর মধ্যেই তা স্তিমিত হয়ে গেছে?

বার্নস অ্যান্ড নোবেল্‌স এক বিশাল বইয়ের দোকান। বিভিন্ন বিভাগ, কত লক্ষ বই যে এখানে আছে, তা কে জানে! অনেক চেয়ার-টেবিল ছড়ানো, যার ইচ্ছে যে-কোনও বই র‍্যাক থেকে এনে টেবিলে বসে পড়তে পারে, আবার সেখানেই বইটা ফেলে রেখেও যাওয়া যায়, কিনুক বা না কিনুক, কেউ কিছু বলবে না।

লাইব্রেরির মতন লোকে এখানে এসে যদি শুধু বই পড়ে চলে যায়, না কেনে, তাতে এদের ব্যবসা চালু থাকে কী করে? তবে এমনই এখানকার সামাজিকতা, যারা এখানে এসে ঢোকে, তারা চক্ষুলজ্জায় হোক বা যে-কোনও কারণেই হোক, একটা না একটা বই না কিনে বেরোয় না। কিছু কিছু বই একটু পুরনো হয়ে গেলে এক জায়গায় ডাঁই করা থাকে, দারুণ সস্তা।

ভেতরে চা-কফি আর কিছু খাবার-টাবারও পাওয়া যায়। একটা বেগেল আর লম্বা এক গেলাশ কফি নিয়ে এসে কুহু বসল একটা চেয়ারে।

ঠিক সাড়ে ছ'টায় মাইক্রোফোনের সামনে এসে বসল এরিকা জঙ্গ। এখনও কিছু চেয়ার খালি আছে, উদ্যোক্তারা বোধহয় একটু দেরিতে শুরু করবে। সাহেবরা, মানে আমেরিকান সাহেবরা সব সময় কাঁটায় কাঁটায় পাংকচুয়াল বলে যে ধারণা আছে, তা মোটেই ঠিক নয়। ব্রডওয়ের থিয়েটার অন্তত দশ-পনেরো মিনিট দেরি করে, ডাক্তারের চেম্বারে নির্দিষ্ট সময়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলেও বসে থাকতে হয়। অনেক প্লেনও ঠিক সময় ছাড়ে না।

এরিকা জঙ্গের প্রথম উপন্যাস 'ফিয়ার অফ ফ্লাইং' পড়তে পড়তে কুহু শিউড়ে উঠেছিল। নারী-পুরুষের শরীর নিয়ে যেমন খুশি কাণ্ড, যখন তখন যৌনগন্ধী ভাষা, স্ল্যাং, এ সব কোনও মেয়ের পক্ষে সম্ভব? পুরুষরা পারে,

কিন্তু এত কাল মেয়েদের পক্ষে যেন নিষিদ্ধ ছিল। এরিকার তখন কতই বা বয়েস, বড়জোর তেইশ-চব্বিশ, সেই বয়েসের প্রথম উপন্যাসে সে অসম্ভব সাহস দেখিয়েছে।

যৌন সংগমে নারী ও পুরুষ সমান অংশীদার। কিন্তু এর গোপনীয়তা আর শিষ্টতা রক্ষার দায়িত্ব শুধু মেয়েদের। পুরুষরা কত কাল ধরে এ সব লিখে এসেছে, পুরুষরা কত রকম যৌন সম্পর্ক মিলিয়ে এখনও প্রকাশ্যে গালাগালি উচ্চারণ করে, মেয়েরা তার এক কণা মাত্র বললেও চতুর্দিকে ছি ছি পড়ে যাবে। মেয়েদের যে ও সব বলতেই হবে, তার কোনও মানে নেই, কিন্তু মেয়েদের সে অধিকার থাকবে না কেন? সেটাই বিরাট প্রশ্ন। এরিকা জঙ্গদের লেখা এরই প্রতিবাদ।

আগের শতাব্দীর মাঝখানে এ সব দেশে যে নারীবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল, জারমেইন গ্রিয়ারের যুগান্তকারী বই 'দা ফিমেল ইউনাক' মেয়েদের যে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, তা খানিকটা স্তিমিত হয়ে যায় এক সময়। দ্বিতীয়বার সেই আন্দোলন আবার মাথা চাড়া দেয় নাওমি উল্‌ফ আর এরিকা জঙ্গদের মতন লেখিকাদের রচনা প্রকাশের পর।

এখন অফিস-টফিসে, সিনেমা-থিয়েটারে মেয়েরাও অনায়াসে এফ দিয়ে চার অক্ষরের শব্দটি উচ্চারণ করে, তাও এই সব বই প্রকাশের ফলে।

এরিকার একটা কথা খুব ভাল লেগেছিল কুহুর। পুরুষ শাসিত সমাজের অবিচারের প্রতিবাদে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ কিংবা সিলভিয়া প্লাথের মতন লেখিকারা আত্মহত্যা করেছিলেন, এরিকা বলেছে, আমি মোটেই মরতে চাই না, লড়াই চালিয়ে ইচ্ছে মতন বেঁচে থাকতে চাই। কিন্তু তো বলেছে এরিকা, নারীর অধিকার অর্জনের জন্য লড়াই আরও চালিয়ে যেতে হবে বহু দিন।

ওঃ, ইচ্ছে মতন জীবন-যাপনের কী দৃষ্টান্তই না দেখিয়েছে এই মহিলা। যখন তেইশ-চব্বিশ বছর বয়েস, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, পছন্দ মতন যে কোনও পুরুষকে সয্যাসঙ্গিনী হতে ডেকেছে, বিয়েও তো করেছে চার বার। ইন্‌গমার বার্গমানের মতন চিত্র পরিচালক বিয়ে করেছেন পাঁচ বার, তা ছাড়াও অনেক নারীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, তা সবাই জানে। এ সব দেশে অনেক পুরুষই এ রকম করে, এরিকাও তার এই সব যৌন লীলার কথা প্রকাশ্যে জানাতে দ্বিধা করেনি।

কুহু শুনেছে যে বাংলাতেও নাকি কিছু কিছু মহিলা এখন গল্প-উপন্যাস-কবিতায় যৌন সম্পর্কের কথা খোলাখুলি লিখছেন, কুহু অনেক দিন বাংলা লেখা পড়েনি। তসলিমা নাসরিন নামে একজন নারীবাদী লেখিকার কথাও সে শুনেছে, এ বার পড়ে দেখতে হবে।

এরিকার বয়েস এখন ষাট পেরিয়েছে। স্বাস্থ্য তো বেশ ভালই আছে দেখা যাচ্ছে। ছবি দেখে যেমন মনে হয়, তেমন লম্বা নয়, মাঝারি উচ্চতা, চোখ দুটি খুব উজ্জ্বল।

মিনিট পনেরো পর কবিতা পাঠ শুরু হল। কিছু দিন আগে গ্রিসের মহিলা কবি সাফোর জীবনী অবলম্বনে একটি উপন্যাস বেরিয়েছে এরিকার। প্রথম কয়েকটা কবিতা সেই সাফোর ওপরেই লেখা।

পশ্চিমী দুনিয়ায় সাফোকেই মনে করা হয় পৃথিবীর প্রথম মহিলা কবি। ভারতেই বা প্রাচীন কালের কোন মহিলা কবির কথা জানা যায়? বেদ-উপনিষদে কয়েকজন ব্রহ্মবাদিনী নারীর উল্লেখ আছে, যাঁরা শ্লোক উচ্চারণ করতেন কিন্তু তাঁদের রচনায় নিদর্শন কোথায়? সাফোর রচনারও কিছু টুকরো টুকরো অংশমাত্র পাওয়া যায়, আর অন্যদের রচনায় তাঁর উদ্ধৃতি। সে সব থেকেই বোঝা যায়, প্রেমের কবিতা রচনা করতেন সাফো। দু'হাজার বছরেরও আগে এক নারীর প্রেমের কবিতা লেখার স্পর্ধা? তাই ইতিহাসে সাফোর পরিচিতি এক দুশ্চরিত্রা হিসেবে।

আরও কিছু কবিতা পাঠের পর শুরু হল প্রশ্নোত্তর।

প্রথমেই একজন মাঝবয়েসি লোক উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার প্রথম বইটার মতন অন্য বইগুলো হচ্ছে না কেন?

এরিকা তেজের সঙ্গে বললেন, কোনও কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন লেখকই আগের বইয়ের মতন পরেরটা লেখে না।

লোকটি বলল, আপনার প্রথম বইটি যত ভাল লেগেছিল পরের বইগুলো—

তাকে থামিয়ে দিয়ে এরিকা বললেন, আপনি আমার লেটেস্ট উপন্যাসটা পড়েছেন? বইটা দেখেছেন?

লোকটি ইতস্তত করে বলল, না, সেটা এখনও পড়া হয়নি।

এরিকা বললেন, না পড়েই কিছু একটা মতামত দেওয়ার অধিকার বুঝি শুধু পুরুষদেরই থাকে। মেয়েরা এ রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা বলে না।

লোকটি বসে পড়তে বাধ্য হল।

এর পর আরও নানা রকম প্রশ্ন। এরিকার উত্তরগুলো মিঠে কড়া, বুদ্ধিদীপ্ত, তবে মুখে হাসি মাখানো।

এক সময় একজন এশিয়ান চেহারার পুরুষ জিজ্ঞেস করল, মিজ জঙ্গ, আপনি সাউথ ইস্ট এশিয়ার দিকে কখনও গেছেন?

এরিকা বললেন, না, সে ভাবে যাওয়া হয়নি। আমি সাউথ আমেরিকায় অনেক ঘুরেছি। মাচুপিচু এত ভাল লেগেছে।

লোকটি বলল, আপনাকে বাংলাদেশে ইনভাইট করলে আপনি যাবেন? ওখানে আপনার অনেক অ্যাডমায়ারার আছে।

এরিকা একটু চিন্তা করে বলল, ব্যাংলাডেশ, ব্যাংলাডেশ, হোয়্যার এগজ্যাক্টলি ইজ দ্যাট কান্ট্রি?

লোকটি বলল, ইন বিটুইন মায়ানমার অ্যান্ড ইন্ডিয়া।

এরিকা বললেন, ইন্ডিয়া, ক্যালকাটা, নো, কোলকাটা, সেখানে একটা বিরাট বুক ফেয়ার হয়। পরের বছর আমেরিকা সেখানে গেস্ট কান্ট্রি। একজন ইন্ডিয়ান পোয়েট, হি লিভ্‌স হিয়ার, গোটম ভাট্টা, ওয়ান অফ দা অর্গানাইজারস, সে আমাকে নিয়ে যেতে চায়, বাট আই ডোন্ট নো...

লোকটি বলল, কলকাতার থেকে ঢাকার বুক ফেয়ার অনেক বড় হয়। আপনার ভাল লাগবে।

কুহুর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। একই দিনে দু'জন চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা। ও তো ইউসুফ। একই রকম আছে চেহারা। ও সব সময় কলকাতার সঙ্গে ঢাকার তুলনা টেনে কলকাতাকে হেয় করতে চায়।

কুহু ঠিক করল, এ বার উঠে পড়বে, সে ইউসুফকে দেখা দিতে চায় না।

ইউসুফের সঙ্গে আরও দু'তিনজন বন্ধু রয়েছে, কুহুর থেকে খানিকটা দূরে। কুহু উঠে দাঁড়াতেই এই শাড়ি পরা মহিলার দিকে এদের চোখ পড়বেই।

এক বন্ধু ইউসুফের কানে কানে কী যেন বলল। এ দিকে তাকিয়েই ইউসুফ বাঙালি স্বভাবে এত লোকজনের মধ্যে চেঁচিয়ে ডাকল, কুহু, এই কুহু!

ধরা পড়ে যেতেই হল।

একটু বাইরে এসে কুহু জিজ্ঞেস করল, তোমরা এই নারীবাদী লেখিকার প্রোগ্রামে এসেছিলে হঠাৎ?

ইউসুফ বলল, পুরুষরাই তো বেশি আসে। দেখলে না শ্রোতাদের মধ্যে পুরুষই বেশি। নারীবাদীদের মুখে পুরুষ-বিরোধী গরম গরম কথা শুনতে আমার বেশ ভাল লাগে।

বন্ধুদের সঙ্গে সে আলাপ করিয়ে দিল, শহীদ আর ইমানুল। ইমানুল বলল, চলেন আপা, আমাদের সঙ্গে চলেন।

কুহু জিজ্ঞেস করল, কোথায়?

ইমানুল বলল, কুইনসে আমাদের এক বন্ধুর বাড়িতে পার্টি আছে। আপনি গেলে সবাই খুশি হবে।

কুহু বলল, আজ পারব না, আমাকে ফিরতে হবে।

শহীদ বলল, আপনি কোথায় যাবেন? যেখানেই থাকেন আমরা পৌঁছে দেব।

ইউসুফ কুহুর একটা হাত চেপে ধরে বলল, চলো, চলো। তোমাকে এত দিন পর পেয়েছি, কিছুতেই ছাড়ব না।

কুহু প্রায় কারওকেই তার গা ছুঁতে দেয় না। ইউসুফ তার হাত ধরেছে পুরনো অধিকারে।

ছিপছিপে লম্বা চেহারা ইউসুফের, মুখে দাড়ি-গোঁফ কিছু নেই, বড় বড় চুল। সব সময়ে সে উচ্ছলতায় টগবগ করে। তার হালকা চালচলন দেখে বোঝাই যায় না যে সে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিসটিকসের অধ্যাপক।

তার বন্ধুদের মধ্যে একজন একটা বইয়ের দোকানের মালিক, অন্যজন দূতাবাস কর্মী। পার্কিংলট থেকে ইমানুল তার লাল রঙের শেভ্রলে গাড়িটা নিয়ে এল।

কুইনসের বাড়িটাতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশজন নারী পুরুষ। সব ঘরেই পার্টি চলছে। বাংলাদেশিদের পার্টি এমনই হয়, যার যেখানে ইচ্ছে বসে পড়ে। কুহু যেমন এসেছে, এ রকম আরও কেউ কেউ রবাহূত হয়ে এসে যোগদান করে। পঞ্চাশজনের মধ্যে তেমন দশজন তো হবেই। তবু

খাদ্য-পানীয় কিছুই কম পড়ে না। সব কিছুরই এলাহি ব্যবস্থা।

অনেকেরই হাতে হাতে নানা রঙের পানীয়ের গেলাশ। সকলেই ধর্মে মুসলমান, তাদের সম্ভবত মদ্যপানে ধর্মীয় নিষেধ আছে, কিন্তু ক'জন আর তা মানে? কেউ কেউ একটু বেশিই পান করে।

কুহুকে ইউসুফ ধরিয়ে দিল স্কচের গেলাশ। কুহু তা কিছুতেই খাবে না, সে স্কচের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। ইউসুফ বলল, এক দিন একটু খেয়ে নাও। এখানে যা ওয়াইন আছে, তোমার পছন্দ হবে না, সাব স্ট্যান্ডার্ড। আস্তে আস্তে খাও।

কুহু বলল, যদি নেশা হয়ে যায়?

ইউসুফ বলল, হলে হবে! রবীন্দ্রনাথের গান আছে না, যা হওয়ার তা হবে। তুমি তো অকূল দরিয়ায় পড়োনি, কূল পেয়ে যাবে ঠিকই।

এখানে প্রায় সকলেই কুহুর অচেনা, দু'একটা মুখ অস্পষ্ট ভাবে আগে কোথাও দেখেছে মনে হয়। সামনে যাকে পাচ্ছে তার সঙ্গেই ইউসুফ কুহুর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে তার ছাত্রী হিসেবে।

ভারী তো ছাত্রী। সিনসিনাটিতে কলেজে পড়ার সময় সেই কলেজে নবীন অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছিল ইউসুফ। মাত্র তিন মাস তার ক্লাস করেছে কুহু, তার পরই অন্য কলেজে চলে যায়। এর পরেও ইউসুফের সঙ্গে দেখা হয়েছে, সে কুহুর বন্ধু হতে চেয়েছিল।

স্কচের প্রাথমিক বিস্বাদটা কেটে গেছে, এখন চুমুক দিতে খারাপ লাগছে না। কুহুর গেলাশ খালি হতেই আবার এনে দিচ্ছে ইউসুফ। বেশ ছনছন করছে শরীর, এটাও কুহুর নতুন জীবনের একটা পদক্ষেপ, সে ওয়াইনের বদলে তীব্রতর সুরা পান করছে।

একটা ঘরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছেন এক মহিলা, লালন ফকিরের গান, ইউসুফ তার পাশে বসে পড়ে গলা জুড়ে দিল। ভালই গায় করে সে। তবে সে যে এখনও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কবিতা আবৃত্তি শুরু করেনি, সেটাই আশ্চর্যের। পেটে কয়েক ঢোঁক অ্যালকোহল গেলেই তার মাথায় কবিতা চাপে। বাংলাদেশের অনেক শিক্ষিত লোকেরই কবিতা লেখার খুব শখ, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়াররাও বাদ যান না। স্ট্যাটিসটিকসের অধ্যাপক ইউসুফ চৌধুরীও দু'খানা কাব্যগ্রন্থ ছাপিয়ে পেলেছে।

এটা কার বাড়ি, কে হস্টেস, কিছুই বুঝতে পারছে না কুহু। পার্টিটাই বা কী উপলক্ষে? হয়তো উপলক্ষ কিছুই না।

কয়েকটা ঘর ঘুরে ঘুরে দেখল কুহু। অনেকেই তাকাচ্ছে তার দিকে, কিন্তু কারওর সঙ্গেই ঠিক ভাব জমছে না। এ বার কুহুকে যেতে হবে। এরই মধ্যে ইউসুফের বন্ধু শহীদ তাকে একটা প্লেটে বিরিয়ানি এনে দিয়েছিল। বাংলাদেশিদের রান্না কাচ্চি বিরিয়ানির স্বাদ অপূর্ব।

এক বার টয়লেটে যাওয়া দরকার। টয়লেটটা কোন দিকে তা কুহু দেখে রেখেছে। তার কাছাকাছি যেতেই টয়লেটের দরজা খুলে বেরিয়ে এল প্রায় কুহুরই সমবয়েসি এক নারী, শালোয়ার-কামিজ পরা, খুব ফর্সা রং, মাথার চুল মেহেদি করা।

কুহুর একেবারে মুখোমুখি হতেই সে মহিলাটি বেশ অবাক হয়ে বলল, কুহু? তুমি এখানে কী করে এলে!

কুহু আমতা আমতা করে বলল, আপনি... আপনি...

মহিলাটি মৃদু ধমক দিয়ে বলল, আমারে চিনতে পারছ না? ভুলে গেছ?

সঙ্গে সঙ্গে কুহু বলল, সুরাইয়া! চিনব কী করে, চুল একেবারে লাল করে ফেলেছ!

ইউসুফের সঙ্গে আলাপের সূত্রে বেশ কিছু বাংলাদেশি পুরুষ ও মহিলার সঙ্গেও এক সময় পরিচয় হয়েছিল কুহুর। রূপসী সুরাইয়া খানমকে ঘিরে ছুক ছুক করত অনেক ছেলেছোকরা।

সুরাইয়া বলল, আর কও কেন, এর মধ্যেই চুলে পাক ধরেছে। অথচ এখনও কত বয়েস পড়ে আছে। তাই চুলে রং করি। তোমারও তো দেখি চুলে কয়েকটা সাদা সাদা চুল ঝিলিক দিচ্ছে, তুমি রং কর না কেন?

কুহু বলল, করি না, মানে, করা হয় না।

সুরাইয়া বলল, তোমাকে মানিয়ে গেছে। আমার মুখের সঙ্গে সাদা চুল ম্যাচ করে না। এই দেশে চুল তাড়াতাড়ি পাকে, তাই না? গরম পানিতে স্নান করি তো।

ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে সুরাইয়া বলল, তুমি তো খাও না, তাই না?

কুহু বলল, হ্যাঁ, একটা খাবো।

দু'জনে একটু সরে গিয়ে একটা জানলার ধারে দাঁড়াল।

সুরাইয়া বলল, আমি সিগারেট ধরালেই এইখানকার অনেক পুরুষের চক্ষু টাটায়। আই কেয়ার আ ফিগ। আমার হাজব্যান্ড কিছু মাইন্ড করে না। বাই দা ওয়ে, তুমি আমার যে হাজব্যান্ডকে দেখেছিলে, সে এখন আর নাই। আমার প্রেজেন্ট হাজব্যান্ডের নাম হবিবুল্লা, সে একজন কসমেটিকস ডিলার।

সুরাইয়ার আগের স্বামীকে কুহু দেখেছে কি না খেয়াল নেই। সে হেসে বলল, ও, সেই জন্যই তোমার গায়ে চমৎকার পারফিউমের গন্ধ পাচ্ছি।

সুরাইয়া বলল, এটা খুব স্পেশাল। তোমাকে একটা দেব। তুমি হায়দারকে চিনলে কী করে?

কে হায়দার?

যে আজ পার্টিটা থ্রো করেছে। সে আগে সুইডেনে থাকত।

না, আমি তাকে চিনি না। আমাকে নিয়ে এসেছে ইউসুফ চৌধুরী।

ইউসুফ? তুমি আবার তার পাল্লায় পড়েছ?

না, পাল্লায় পড়িনি। অনেক দিন পর আজ হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বার্নস অ্যান্ড নোব্‌লসে। তার পর আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এল। আমি এখানকার প্রায় কারওকেই চিনি না।

তুমি ওই স্টুপিডটাকে আর পাত্তা দিও না কুহু।

সে রকম কোনও সম্ভাবনাই নেই, কিন্তু তুমি এ কথা বলছ কেন?

জানি তো, সে এক সময় তোমার পিছু লাগছিল। এখন যদি আবার লাই দাও, তোমার সঙ্গে লেপ্টে থাকবে, রোজ তোমাকে বিরক্ত করবে।

সে সম্ভাবনা নেই। তোমাকেও বিরক্ত করেছে নাকি?

আমারে বিরক্ত করবে? পিট্টি লাগাবো না! আই হ্যাভ আ সলিড হাজব্যান্ড। জানো, ছেলেটার জন্য আমার মায়াও হয়। গুণ তো আছে অনেক, অথচ লাফাঙ্গার মতন ঘুরে বেড়ায়। ডিভোর্সটার পর আর কিছুতেই থিতু হইল না। কত বলি, তুই আর একটা শাদি কর, তাতে ও ছেলে কানই দেয় না।

কুহু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ওর বিয়েটা ভেঙে গেছে? সেটা আমি শুনিনি।

সুরাইয়া বলল, দুই বৎসর মোটে টিকেছিল। কালচারাল কোনও মিল ছিল না তো? ইউসুফ গান-বাজনা ভালবাসে, যে-কোনও পার্টিতে গিয়ে লাফালাফি করে জমাইয়া দেয়, তুমি তো জানো। আর বউটা ছিল গম্ভীর, তারা বুঝত না তো। সে বেচারির তেমন দোষও নাই। বিয়েটাই ভুল হয়ছিল। তার পর তো ইউসুফ দেশে ফিরে গেল, জাহাঙ্গির নগর ইউনিভার্সিটিতে চাকরিও নিয়েছিল, ভালই ছিল। সত্যি কথা বলতে কী, ওটাই ওর ঠিক জায়গা। এ দেশে ওকে মানায় না। তবু আবার ফিরে এল, ওর মায়ের ইন্তেকালের পর। ঢাকায় মন টেকে না, তবু প্রত্যেক বছর যাওয়া চাই। তুমি এখন কোথায় থাকো কুহু?

এই দিকেই থাকি।

তোমারে ভাল দেখাচ্ছে খুব। ইউ লুক লাইক আ ফুল্‌লি গ্রোন উয়োম্যান।

ফুল্‌লি গ্রোন? তা তো হবেই, বয়েস তো কম হল না।

না, না, সে কথা হচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথের গান আছে, 'তুমি পৌঁছিলে পূর্ণিমাতে।' সেই। আমার বয়েস তোমার থিকা একটু বেশি, তাই।

সুরাইয়া, তুমি হচ্ছ সত্যিকারের সুন্দরী।

থ্যাঙ্ক ইউ! অনেক ছেলেই এই কথা বলে। কিন্তু মেয়েদের কাছ থেকে এ রকম কমপ্লিমেন্ট পেলে আমার বেশি ভাল লাগে।

সুরাইয়ার পাশে অন্য একটি দম্পতি এসে দাঁড়াল। তখনই সরে পড়ল কুহু। এ বার তাকে যেতে হবে।

মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে, দু'হাত তুলে কবিতা আবৃত্তি করে চলেছে ইউসুফ। কুহু সেই ঘরে এসে এক কোণে দাঁড়াল।

একটি কবিতা শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কবিতা ধরল ইউসুফ। প্রথম লাইনটা বলার আগে খুব সূক্ষ্ম ভাবে চোখ টিপল কুহুর দিকে চেয়ে।

যদি তাকে বলি, দুটি চোখ দুটি নদী
সে বলবে, আহা এটা কি নতুন কথা!
যদি তাকে বলি, ওষ্ঠে অমৃত কণা
সে বলবে যাঃ, থামাও তো চপলতা!
যদি তাকে বলি, কোথায় তোমার বাড়ি

সে বলবে আমি থাকি এক মরুভূমে
যদি তাকে বলি, সেখানে উঠেছে ঝড়
সে বলবে আমি, থাকবো গভীর ঘুমে
যদি তাকে বলি...

কবিতাটা শেষ হওয়ার পর সবাই হাততালি দিল। একটি মেয়ে বলল, আর একটা, ইউসুফ ভাই, আর একটা।

কুহু কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, ইউসুফ, আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে হবে, আমি বাড়ি যাব।

ইউসুফ বিস্মিত ভাবে বলল, ট্যাক্সিতে যাবে, কোথায়?

কুহু বলল, রেল স্টেশানে।

এত রাতে তুমি একা একা ট্রেনে কত দূরে যাবে?

এমন কিছু রাত হয়নি, অনেক মেয়েই তো যায়। তা ছাড়া খুব দূরে যাব না।

তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে ইউসুফ বলল, যদি দূরেই না যাও, তা হলে ট্রেনে কেন, আমরা তোমাকে গাড়িতে পৌঁছে দেব।

কুহু বলল, না, না, তার দরকার নেই। পার্টি ছেড়ে তুমি যাবে কেন? এখনও সবাই রয়েছে। তুমি থাকো, আমার কোনও অসুবিধে নেই।

সে কথায় কর্ণপাত না করে ইউসুফ চেঁচিয়ে বলল, শহীদ, ইমানুল, তোরা যাবি না?

ইমানুল বলল, আমি রেডি। দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি।

কুহু অনেক বার প্রত্যাখ্যানের চেষ্টা করল, কোনও কাজ হল না। বাঙালদের নিয়ে এই এক মুশকিল, একবার যেটা জেদ ধরবে, সেটা কিছুতেই ছাড়বে না।

গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিং-এ হাত দিয়ে ইমানুল বলল, ভয় নাই, আমি সামান্য বিয়ার খেয়েছি, গাড়ি চালাতে হবে বলে ড্রিংক করি নাই। কোথায় যেতে হবে বলুন।

কুহু বলল, হোয়াইট প্লেনস। আমি রাস্তা চিনিয়ে দিচ্ছি।

ইউসুফ চেঁচিয়ে উঠে বলল, হোয়াইট প্লেনস! ডাক্তার জাহাঙ্গির ইকবালের বাড়ি। কত বার গেছি। কী রে ইমানুল, চেনোস না?

ইমানুল বলল, লাইক দা পাম অব মাই হ্যান্ডস!

কুহুকে সামনে বসিয়েছে, বাকি পুরুষ দু'জন পেছনে। একটু পরেই তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে শহীদ বলল, নিন, একটা চুমুক দিন।

ভয় পেয়ে গিয়ে কুহু বলল, এটা কী?

শহীদ দুষ্টুমির হাসি দিয়ে বলল, হুইস্কি, অনেকখানি পানি মিশিয়ে এনেছি। আপনার অসুবিধে হবে না।

কুহু বলল, চলন্ত গাড়িতে ড্রিংক করা বে-আইনি! প্যাসেঞ্জাররাও ড্রিংক করতে পারে না। পুলিশ খুব স্ট্রিক্ট। যখন তখন গাড়ি থামিয়ে উঁকি দিতে পারে।

ইউসুফ বলল, মাঝে মাঝে আইন ভাঙতে ইচ্ছে করে না? শিব ঠাকুরের আপন দেশে, আইনকানুন সর্বনেশে। সব আইন মেনে চললে জীবনটা ডাল হয়ে যায়। আমরা এখানে পুলিশের সঙ্গে প্রায়ই ক্যাট অ্যান্ড মাউজ খেলি, এখনও এক বারও ধরা পড়িনি।

শহীদ বলল, কুহুদি, আজ আপনি সঙ্গে আছেন, আজ তো ধরা পড়ার কোনও কোয়েশ্চেনই নেই।

ওদের পেড়াপিড়িতে বোতল থেকে এক চুমুক দিয়ে ফেলল কুহু।

ইমানুল বলল, পুলিশের গাড়ি আসছে কি না আমি নজর রাখছি। ব্যাটারা অনেক সময় ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

চলন্ত গাড়িতে তিনজন পুরুষ, কুহু তাদের সঙ্গে বসে মদ্যপান করছে। হাতে হাতে সিগারেট। এ রকম কুহুর জীবনে আগে কখনও ঘটেনি। প্রদীপ এ রকম ঝুঁকি নেওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না।

ইউসুফ জিজ্ঞেস করল, কুহু, আমি যে শেষ কবিতাটা পড়লাম, তুমি সেটা চিনতে পারলে?

কুহু বলল, হ্যাঁ, আগে শুনেছি।

শহীদ উদ্দেশ্যমূলক গলায় জিজ্ঞেস করল, ওটা কাকে নিয়ে লিখেছিস রে?

ইউসুফ বলল, যে ছিল আমার স্বপনচারিণী, তারে চিনিতে পারিনি, তারে বুঝিতে পারিনি।

বোতলটা শেষ হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। বেশি খেয়েছে ইউসুফ আর শহীদ, কুহু ছোট ছোট কয়েকটা চুমুক দিয়েছে মাত্র। ওদের দু'জনেরই কথা একটু জড়িয়ে গেছে।

কিন্তু কুহু জানে, ওরা কিছুতেই তার সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করবে না, একটা খারাপ শব্দও উচ্চারণ করবে না।

হোয়াইট প্লেইনসে এক্সিট লেনে ইমানুল জিজ্ঞেস করল, এর পর কোন রাস্তা।

কুহু বলল, এখন সোজা চলুন। তার পর আমি বলে দেব।

কিছুক্ষণ গিয়ে কয়েকবার ডান-দিক বাঁ-দিক করার পর কুহু বলল, সামনের যে থার্ড রেড লাইট, ওখানে আমাকে নামিয়ে দিন।

ইমানুল বলল, লাইট পোস্টে? ওখানে কোনও বাড়ি নেই।

ইউসুফ বলল, তোমার বাড়িটা কোথায়? তোমাকে একেবারে বাড়ির দরজা পর্যন্ত নিয়ে যেতে চাই।

কুহু বলল, তার দরকার নেই। বাকিটা আমি হেঁটে যাব।

ইউসুফ বলল, কেন? আমরা তো আশা করেছি, তোমার বাড়ির কাছে গেলে তুমি আমাদের ভেতরে আসতে বলবে। আমরা কফি খেতে খেতে আরও কিছুক্ষণ আড্ডা দেব।

তা সম্ভব নয়।

সম্ভব নয়? প্রদীপদা রাগ করবেন?

সে প্রশ্নই উঠছে না। তোমাদের এখান থেকেই ফিরে যেতে হবে।

কেন এ রকম বলছ, সেটাই তো বুঝতে পারছি না। বেশিক্ষণ না, আর আধ ঘন্টা?

না।

শহীদ বলল, আর জোর করা উচিত নয়, উনি যখন চাইছেন না, নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে।

গাড়ি থেকে নেমে কুহু বলল, থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ অল ফর এভারিথিং। গুড নাইট।

ইউসুফ বলল, কুহু, তোমার ফোন নাম্বারটা নেওয়া হয়নি। তোমার সঙ্গে পরে যোগাযোগ করতে চাই।

কুহু বলল, স্যরি। আমার ফোন নাম্বার এখন কারওকে দিচ্ছি না।

সে হাঁটিতে শুরু করে দিল।

নির্জন রাস্তায় তার হাই হিলে খটখট শব্দ হতে লাগল। একটু খানি গিয়ে সে এক বার পেছন ফিরে দেখল, গাড়িটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

সে বেঁকে গেল একটা অন্য রাস্তায়। এই রাস্তাটা খানিকটা ঘুরে তার বাড়ির পেছন দিকটায় পৌঁছে দেবে।

আর এক বার সে পেছনে ফিরে নিশ্চিন্ত হতে চাইল, ওরা তাকে অনুসরণ করছে কি না। না, আসছে না গাড়িটা।

ইউসুফের সঙ্গে সে আর নতুন করে যোগাযোগ শুরু করতে চায় না। সুরাইয়া সাবধান করে না দিলেও সে আগেই এটা ঠিক করে ফেলেছিল।

একটা বিকেলের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় কুহুর মুখে খানিকটা হাসি ফুটে উঠল। মাঝে মাঝেই আপন মনে হাসা তার স্বভাব।

ছাত্রজীবন শেষ হয়ে এসেছে, ইউসুফ একদিন একটা মেক্সিকান রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খাওয়াল কুহুকে। কাছেই একটা বেশ বড়, সুদৃশ্য পার্ক। অনেকটা জলাশয়। দিনটাও খুব সুন্দর ছিল, ঈষৎ মেঘলা, ফুরফুরে বাতাস।

সেই পার্কে বেড়াতে বেড়াতে ইউসুফ একটা বড় মেপল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কুহু, তোমায় একটা প্রশ্ন করতে পারি? ধরো, একটা বেশ কট্টর রোমান ক্যাথলিক পরিবারের ছেলের সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক হয়, তাকে তুমি বিয়ে করতে পারবে?

কুহু বলেছিল, এ আবার কী অদ্ভুত প্রশ্ন। সম্পর্ক মানেটাই বা কী? আমি এ দেশের ছেলেমেয়েদের মতন বিয়ের আগে কারওর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক করতে চাই না। আসল হচ্ছে মনের মিল। সে রকম কোনও ছেলের সঙ্গে মনের মিল হলে বিয়ে তো হতেই পারে।

ইউসুফ বলল, ধর্মীয় কোনও বাধা হবে না?

কুহু বলেছিল, আমার দিক থেকে কোনও বাধা নেই। তবে, তোমার প্রশ্নটার মধ্যেই ভুল আছে। কট্টর রোমান ক্যাথলিক যদি হয়, তারা অন্য ধর্মের মেয়ে বিয়েই করবে না। বিশেষ করে আমাদের মতন পেগান হিন্দু... প্রোটেস্টান্টরা অতটা গোঁড়া নয়।

তোমার কি সাহেব ছেলেই বেশি পছন্দ?

এখনও সে রকম কারওকে পছন্দ হয়নি।

কুহু দু'জন শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানের সঙ্গে ডেট করেছে এ পর্যন্ত, বেশি দূর এগোয়নি। সাহেব বিয়ে করার ব্যাপারে তার মনের মধ্যে খানিকটা বিরূপতাই আছে। যে দু'তিনজন ভারতীয় মেয়েকে সে এ দেশের ছেলেদের বিয়ে করতে দেখেছে, তারা সামাজিক ভাবে এক সময় দূরে চলে যায়। প্রথম প্রথম আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুদের আড্ডায় তারা স্বামীদের নিয়ে এসেছে। তখন একটা অস্বস্তিকর অবস্থা হয়, ভাষার ব্যবধানের জন্য প্রাণ খুলে কথা বলা যায় না। ইংরেজিতে আর কাঁহাতক গল্প হয়। কেউ একটা বাংলা রসিকতা করলে অন্যরা হেসে ওঠে, সাহেব চুপ করে থাকে বোকার মতন। তখন সেই রসিকতা ইংরেজিতে বোঝানো এক বিড়ম্বনা। কিছু দিন পরে আর তারা আসে না। কুহুর চেনা এ রকম তিনটি বিয়ের পর দুটি মেয়েরই ডিভোর্স হয়ে গেছে।

ইউসুফ আবার জিজ্ঞেস করেছিল, ধরো, এ দেশের কোনও ব্ল্যাক আফ্রিকান-আমেরিকান ছেলে যদি তোমাকে বিয়ে করতে চায়, তুমি রাজি হবে?

কালো বলেই রাজি হব না, তার কোনও মানে নেই। তার সঙ্গে আমার মনের মিল হবে কি না, সেটাই বড় কথা।

আমাদের সাবকন্টিনেন্টের মেয়েরা কেউ কেউ সাদা সাহেব বিয়ে করে, কিন্তু কালো ছেলেকে বিয়ে করেছে, এ রকম একজনও দেখিনি।

তা অনেকটা ঠিক। কালোদের সঙ্গে আমরা তেমন মেলামেশা করি না। কালচারাল ডিফরেন্সও আছে। সত্যি বলছি, কালোদের সম্পর্কে আমার কোনও প্রেজুডিস নেই। তা বলে একটা এক্‌জামপল সেট করার জন্য আমি কোনও কালো মানুষকে বিয়ে করব না।

তুমি কোনও মুসলমানকে বিয়ে করতে পারবে?

ধর্ম দিয়ে আমি কোনও মানুষকে বিচার করতে চাই না। তুমি এ সব কথা জিজ্ঞেস করছ কেন বল তো?

ধরো একজন বাংলাদেশি মুসলমান ছেলে যদি তোমাকে বিয়ে করার জন্য ব্যাকুল হয়, তোমাদের পরিবার মেনে নেবে?

শোনো, আমাদের পরিবারে ধর্মের কোনও স্থান নেই। আমার মা কনফার্মড ইথিয়িস্ট। বাবার জন্ম ব্রাহ্ম পরিবারে, তিনিও এখন কোনও ধর্ম মানেন না। আমিও ছোটবেলা থেকে এমনভাবে মানুষ হয়েছি যে ধর্ম নিয়ে কখনও মাথাই ঘামাইনি। তুমি যা বললে, আমাকে বিয়ে করার জন্য কোনও বাংলাদেশি মুসলমান ব্যকুল হয়েছে নাকি?

ইয়েস! হি ইজ ম্যাডলি ইন লাভ উইথ ইউ। এত দিন মুখে বলেনি। চেহারা খারাপ নয়, ভালই লেখাপড়া জানে, ভাল ফ্যামিলির ছেলে, এখানে মোটামুটি চাকরি করে, উন্নতির আশা আছে।

আমি কি চিনি তাকে? কেন সে হঠাৎ আমাকে ভালবেসে ফেলল?

এটা তুমি একটা অদ্ভুত কথা বললে কুহু। রাধা কি কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করেছে কখনও, তুমি আমায় কেন ভালবাসলে? জুলিয়েট কি রোমিওকে জিজ্ঞেস করেছে, লায়লা কি মজনুকে, ইসল্ট কি ত্রিস্তানকে... ভালবাসা এক রহস্যময় কেমিস্ট্রি, কী করে যে হয়, বোঝা যায় না।

ইউসুফ কুহুর একটা হাত ধরে হাঁটু গেড়ে বসে বলেছিল, আমি তোমাকে ভালবাসি কুহু, আমি তোমার পাণি গ্রহণ করতে চাই।

বেশ কিছুক্ষণ ইউসুফের মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে ছিল কুহু। তার দুই গালে লেগেছিল রক্তিম ছোপ।

খুব একটা আহামরি ধরনের রূপসী নয় কুহু, কিন্তু তার শরীর ও মুখ চোখের গড়ন ও ব্যক্তিত্বের জন্য অনেক ছেলেই ঘুর ঘুর করেছে তার চার পাশে। প্রদীপের সঙ্গেও বন্ধুত্ব হয়েছে তখন। তবে অধিকাংশ ছেলেই দারুণ স্কলার, চেহারাও ভাল, তবু কেমন যেন ডাল মনে হত কুহুর। তাদের মধ্যে ইউসুফের সঙ্গেই সময় কাটাতে বেশি ভাল লাগত তার। ইউসুফ যখন তখন কবিতা বলে, গান গায়, লাফালাফি করে, এই সব পাগলামিই কুহুর পছন্দ।

হাত ধরে থেকে ইউসুফ বলেছিল, বলো, বলো, উত্তর দাও!

এর আগে কুহুর সামনে কেউ সরাসরি ভালবাসা কথাটা উচ্চারণ করেনি। ভেতরে দারুন একটা দোলা লেগেছিল তার।

সে ধরা গলায় বলেছিল, এখনি তো কিছু বলতে পারছি না, একটু সময় দাও।

ইউসুফ বলেছিল, তোমার বাড়ির লোকদের বোঝাতে হবে। তুমি বললে, তারা ধর্ম মানেন না। কিন্তু আমি জানি, মুসলমানদের সম্পর্কে একটা সংস্কার থাকেই ভেতরে ভেতরে।

কুহু বলেছিল, কেন হিন্দু-মুসলমানে কি বিয়ে হয় না? আমাদের কলকাতাতেও তো হয় দেখেছি। তা ছাড়া, আমি যদি চাই, আমার বাবা-মা কিছুতেই বাধা দেবেন না। ওরা কোনও দিন আমাকে শাসন করেননি। আর একটা কথা, এখনও কিছু ঠিক হয়নি, তবু কথার কথা বলছি, তোমাদের পরিবারেও তো আপত্তি হতে পারে। হিন্দুরা পৌত্তলিক, খাঁটি মুসলমানরা তাদের পরিবারে হিন্দু বউ পছন্দ করবে কেন?

ইউসুফ হেসে বলেছিল, আমাদের সে সমস্যা নেই। ইসলামে অন্য যে কোনও ধর্ম থেকে কন্যা আনা যায়, তার পর তাকে মুসলমান করে নেওয়া হয়। আমার বড় ভাই এক ব্রিটিশ মেয়েকে বিয়ে করেছে, তার নাম ছিল অ্যালিস, এখন আয়েষা।

আমাকেও মুসলমান হতে হবে নাকি?

হয়ে যাবে, ক্ষতি কী? ধর্মই যখন মানো না, তখন হিন্দু থাকলে না মুসলমান, তাতে কী আসে যায়?

যে ধর্ম মানে না, তার ধর্মান্তর গ্রহণটাই কি হাস্যকর নয়? শেষে বুঝি আমাকে বোরখা পরাবে?

আরে না, না, ওসব কিছু না। থাকব তো এ দেশে। আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। ধর, তুমি মুসলমান হতে চাইলে না, বেশ, মেনে নেওয়া হল। তখন আমি যদি হিন্দু হতে চাই, তোমাদের ধর্ম, তোমাদের সমাজ কি আমাকে অ্যাকসেপ্ট করবে? হিন্দুরা এক সময় ছিল খুব ক্লোজড সোসাইটি। বাইরের কারওকে ঢুকতে দিত না। অম্বেডকর তাঁর দলবল নিয়ে বাধ্য হয়ে বৌদ্ধ হলেন। এখন তো দেখি ইসকনের আমেরিকার ছেলে-মেয়েরা দিব্যি হিন্দু হচ্ছে, ছেলেরা মাথায় টিকি রেখে হরে কৃষ্ণ হরে রাম গান গেয়ে রাস্তায় দিব্যি লাফাচ্ছে, তাতে হিন্দু পণ্ডিতরা খেপে যায়নি। কিন্তু কোনও মুসলমান হিন্দু হতে পেরেছে? মুসলমানের জন্য এখনও দরজা বন্ধ। ইসলাম ধর্ম অনেক উদার।

ওসব আমি জানি না। রিলিজিয়ান ইজ নট মাই কাপ অফ টি। হঠাৎ ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাতেই বা যাব কেন? হিন্দুরা নিজেদের বোকামিতে উচ্ছন্নে যাক, মুসলমানরা মারামারি কাটাকাটি করুক, তাতে আমি লিস্ট বদারড। ভগবানই একটা গাঁজাখুরি ব্যাপার, তার নামে আবার আলাদা আলাদা ধর্ম। মানুষ যত দিন না এটা বুঝবে, তত দিন পৃথিবীতে শান্তির আশা নেই। বাইদা ওয়ে, তুমি বুঝি খুব ধর্ম মানো?

খুব না। ওপরে ওপরে মানি। রোজা রাখি না, নামাজও পড়ি না। তবে বিশ্বের সব মুসলমানদের সঙ্গে সম ভ্রাতৃত্ব অনুভব করি।

শেষ পর্যন্ত ধর্মই একটা কঠিন বাধা হয়ে দাঁড়াল।

ইউসুফকে বাড়িতে নিয়ে এল কুহু।

অমিতা আর অমলেশ দু'জনেই বেশ পছন্দ করলেন তাকে। যে কোনও পরিবেশে অল্প সময়ে জমিয়ে তুলতে পারে ইউসুফ। মাঝে মাঝে খাবার নিয়ে আসে, শিক কাবাব, বিফ কারি, বিরিয়ানি। বিয়ে হবার আগেই যেন সে ঘরের ছেলে।

কুহুও তত দিনে অনুভব করেছে, ইউসুফ মানুষটা খাঁটি। তার চরিত্রে কোনও মালিন্য নেই। যারা মিথ্যে কথা বলে, যারা অসততাকে প্রশ্রয় দেয়, তাদের দু' চক্ষে দেখতে পারে না কুহু। ইউসুফ তার জীবনসঙ্গী হতে পারবে।

বিয়ের আলোচনা চলতে লাগল।

ঢাকায় মা-বাবার কাছে চিঠি লিখে কুহুর ছবি পাঠাল ইউসুফ। তাঁরা দু'জনেই সানন্দে সম্মতি দিলেন। তবে বিয়ের উৎসব হবে ঢাকাতে। আমেরিকায় রেজিস্ট্রি হোক বা যাই-ই হোক, আসল উৎসব ঢাকায় হবে সব নিয়ম মেনে। বায়তুল মোকাররমের ইমাম কলমা পরিয়ে কুহুকে দীক্ষা দিয়ে মুসলমান করবেন, তার পর ইউসুফের মা আশীর্বাদ করে ঘরে তুলবেন নববধূকে। কুহুর একটা নামও ঠিক হয়ে গেছে, নূরজাহান বেগম।

সে চিঠি পড়ে কুহু প্রথমে হেসে গড়িয়ে পড়ল। নূরজাহান বেগম! হিস্টোরিকাল নেম। বাবারে! সব সময় বেগম সেজে থাকতে হবে? শোনো ইউসুফ, তোমাকে তো বলেই দিয়েছি, ওই সব ফার্স আমি করতে পারব না?

ইউসুফ বলল, কোনও রকমে একটু মুখ বুজে সহ্য করে যাবে। তার পর আর বিশেষ কিছু মানতে হবে না। মা এই একটা ব্যাপারে জেদ ধরেছেন। জান তো, আমরা আট বোন এক ভাই। একমাত্র পুত্র সন্তান বলে আমার প্রতি মায়ের... বুঝলে, আমি মা-কে দুঃখ দিতে চাই না। যদি তুমি চোখ কান বুজে একবার...

কুহু বলল, উইথ অল রেসপেক্ট টু ইয়োর মাদার, ধর্মে অবিশ্বাসী হয়েও ধর্ম মেনে নেবার ভান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি ভান করতে পারি না কোনও ব্যাপারেই। এ রকম হলে আমি ঢাকাতেই যাব না।

মা-কে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করবার জন্য চিঠি লিখল ইউসুফ। তিনি তাঁর জেদ ধরে রইলেন।

কুহুর মা অমিতা অত জেদি নন, কিন্তু তিনিও এ শর্ত শুনে বিরক্ত হলেন বেশ।

তিনি মেয়েকে বললেন, তুমি যদি এতে রাজি হও, আমরা আপত্তি করব না। আফটার অল বিয়ের পর তোমরা আলাদা জায়গায় থাকবে, আমার বা তোমার বাবার আপত্তিতে কী আসে যায়। আমরা আশীর্বাদও করব ঠিকই। তবু একটা কথা বলে রাখছি, বিয়ের প্রথমেই যদি এ রকম একটা ইমমরাল শর্ত মানতে হয়, তা হলে এর পর যদি আরও পর পর শর্ত থাকে? তুই ওয়াইন টোয়াইন খাস, ইসলামিক ফ্যামিলিতে ওসব বারণ। শুয়োরের সসেজ- স্যালামি তোর ফেভারিট, আর জীবনে খেতে পারবি না। আমরা বিফ খাই, কিন্তু ওরা শুয়োর ছোঁয় না। আলম সাহেবের স্ত্রীকে দেখি মাথায় আধঘোমটা দিয়ে থাকেন, কপালে একটা কালো কাপড়ের পট্টি বাঁধা থাকে। হিজাব না কী যেন বলে। ঢাকাতেও নাকি অনেকেই এখন বোরখা পরে।

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে কুহু বলল, তুমি এসব কী বলছ মা? তুমি তোমার মেয়েকে চেনো না? আমি মানব শর্ত? শর্ত মেনে বিয়ে মানেই তো স্বামীর দাসত্ব মেনে নেওয়া। কমপ্লিট সাবজুগেশান। আমি ইউসুফকে বলে দিয়েছি, পরস্পরের ইচ্ছের স্বাধীনতার মূল্য দিতে হবে। আদারওয়াইজ ইউ গো টু হেল!

মায়ের মন ফেরাবার জন্য ইউসুফ চলে গেল ঢাকা। তার পর আর আসেই না, আসেই না, কুহুকেও কোনও খবর দেয় না। কয়েক মাস পরে কানাঘুষোয় শোনা গেল, মা-কে নিয়ে আজমীর শরিফে তীর্থ করতে গিয়েছিল ইউসুফ। সেখানে লখনউ-এর একটি মেয়েকে দেখে তাঁর মায়ের এমন পছন্দ হয়ে গেল যে তাকে আর ছাড়লেন না। মাতৃভক্ত ইউসুফ সেখানেই বিয়েতে রাজি হয়ে গেল কুলসমকে।

কুহুকে সে খবর জানায়ওনি, নিশ্চয়ই খুব লজ্জা পেয়েছিল।

তার পর এক যুগ কেটে গেছে। মন থেকে প্রায় মুছে গিয়েছিল ইউসুফ, আবার এত কাল পর হঠাৎ দেখা।

না। আর ইউসুফের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ চায় না কুহু।

॥ ৬ ॥

সখী, ভালবাসা কারে কয়?

ব্যক্তি স্বাধীনতা মানে যে যথেচ্ছাচার নয়, তা কুহু জানে।

স্বামী-পুত্র-কন্যার দায়িত্ব নেই। বাবা-মা দূরে থাকেন বলেই যে কুহু যত খুশি আলস্য করবে, যা খুশি খাবে, যার তার শয্যাসঙ্গিনী হবে, যেখানে ইচ্ছে রাত কাটাবে, কুহু তা চায় না। এ ধরনের জীবন যাত্রা বেশি দিন চলে না। খানিকটা ভাল্গারও বটে।

একটি মেয়ের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জনের অর্থ তার মনের আরও প্রসার ঘটানো, জীবনটাকে একটু অন্তত উন্নত করা। আমি যেমন আছি, তার থেকে আর একটু ভাল মানুষ হতে চাওয়া। ভাল মানুষ? না, তা ঠিক নয়। ভাল মানুষ কথাটার সঙ্গে খানিকটা বোকামি মিশে আছে। আর একটু সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন হওয়া। জগৎটার দিকে যুক্তিবোধ নিয়ে তাকানো।

প্রায় তিন দিন কুহু কিছুই খায়নি।

নিজে রান্নাও করেনি, বাইরেও খেতে যায়নি। কেন খায়নি? শুধু দেখছিল, না খেয়ে কতটা সময় কাটানো যায়। উপোস করলে শরীরটা বেশ হালকা লাগে। ঘুমের একটু অসুবিধে হচ্ছে। নতুন জায়গাতে এমনিতে একটানা ঘুম হয় না। কম্পিউটারে অনেক সময় কেটে যায়।

জিনিসপত্র সবই তো কেনা হয়েছে। কিন্তু রান্না করতে হবে শুধু নিজের জন্য? ভাবলেই কেমন যেন লাগে। এ যেন চরম স্বার্থপরতা। কুহু কোনও দিন শুধু একজনের জন্য রাঁধেনি। যে সব পুরুষ একলা থাকে, তারা কী করে? কখনও সখনও রান্না করে নিশ্চয়ই। শুধু নিজের জন্য, না বন্ধু-বান্ধবীদের ডাকে? তাদের তো ছেলেমেয়ের কথা ভাবতে হয় না?

প্রদীপ এখন কী করবে?

সে যা খুশি করুক, তা নিয়ে কুহু মাথা ঘামাতে যাবে কেন? এত দিন এ দেশে আছে, রান্নাবান্না কিছুই শেখেনি। টোস্ট সেঁকতে পারে আর চা-কফি। তাই খেয়েই থাকুক। কিংবা যার সঙ্গে লটঘট করছে, ডেকে আনুক তাকে, সে যত্ন করে রেঁধে খাওয়াবে।

ছেলে আর মেয়ের কথা ভেবে সকালবেলা কষ্ট হচ্ছিল খুব। কষ্ট তো হবেই। তবে ছেলে আর মেয়েকে তো সে ছেড়ে আসেনি, ওরা হস্টেলে গেছে। ছুটির সময় ওরা এসে থাকবে তার কাছে। হয়তো ক্যাম্পিংও করতে যাবে।

মোবাইল ফোন বেজে উঠল। ফুটে ওঠা নম্বরটা দেখে নিল কুহু। মা। ফ্রিজ খুলে একটা ফ্রুট জুসের বোতল বার করে তার পর সাড়া দিল।

অমিতা জিজ্ঞেস করলেন, কী খেলি সকালে।

কুহু বলল, এই তো ফ্রুট জুস খাচ্ছি। এর পর ব্রেকফাস্ট খাব। আজ দেরি করে উঠেছি।

শুতে বেশি রাত হয়েছিল? কোথাও গিয়েছিলি?

হ্যাঁ। একবার স্বর্গটা ঘুরে এলাম।

স্বর্গ?

ইয়েস, মম। যে দেশে রজনী নাই মা।

বুঝেছি, কোথায় গিয়েছিলি তা জিজ্ঞেস করা চলবে না। ভুলে গিয়েছিলাম।

যদি বলি লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম, বিশ্বাস করবে? রাত দুটো পর্যন্ত খোলা থাকে। তখনও দশ বারোজন লোক বসে পড়ছিল।

বই বাড়িতে আনা যায় না?

তা তো যায়ই। আমি মেম্বার হয়ে গেছি। তবু লাইব্রেরির অ্যাটমসফিয়ারে পড়তে ভালই লাগে।

কিছু রান্না করবি, না বাইরে খেয়ে নিবি? থাক, থাক, এর উত্তর দিতে হবে না।

হা-হা-হা। কেন উত্তর দিতে হবে না মা?

এই সব মানডেন কোশ্চেন এমনি মুখে এসে যায়। মোট কথা ভাল আছিস তো?

চমৎকার। তুমি আর বাপি ঝাগড়া-টগড়া করছ তো?

কেন, ঝগড়া করব কেন?

মাঝে মাঝে একটু আধটু ঝগড়া করলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

তোর বাবা এখন ছাদে উঠেছে। নিজে ছাদ সারাবে। বয়েসটা মনে থাকে না।

বয়েসটা সব সময় মনে না রাখাই তো ভাল মা। বাপি সব সময় কাজের মধ্যে থাকেন বলেই তো শরীরটা ভাল আছে।

ও এই উইন্টারে দেশে যাবে বলছে। তুই যাবি নাকি? তা হলে তোরও টিকিট বুক করি।

যেমন ছোটবেলায় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে? যাতে আমি হারিয়ে না যাই, তাই সব সময় চোখে চোখে রাখা। আমি বোধ হয় পনেরো বছর বয়েস পর্যন্ত বাধ্য মেয়ের মতন... তার পর যে-ই ষোলো বছর হল, আমি রিভোল্ট করলাম, তাই না?

ষোলো বছর বয়েসে তুই সান্ত্রা বলে একটা মেয়ের সঙ্গে স্পেনে বেড়াতে গেলি।

সান্ত্রার বয়ফ্রেন্ডও আমাদের সঙ্গে ছিল। তোমাদের বলিনি তখন।

তুই অনেক দিন কলকাতায় যাসনি। তিন বছর।

যাব। ওয়ান অফ দিজ ডেজ, তবে এই উইন্টারে নয়। তোমরা ঘুরে এসো।

এই রকমের সংলাপ চলল আধ ঘণ্টা।

চট করে এক কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে কুহু গিয়ে বসল বারান্দায়। সঙ্গে এক পিস টোস্ট খাবে কি খাবে না, তা নিয়ে দ্বিধা করল কয়েক মুহূর্ত, তার পর ভাবল, এখন থাক, পরে দেখা যাবে।

এ বারে গুছিয়ে নিতে হবে জীবনটা।

ইউনিভার্সিটিতে একটা ক্রিয়েটিভ রাইটিং-এর কোর্স নেবে ঠিক করেই ফেলেছে। একটা বিজ্ঞাপন দেখে রেখেছে, সেখানে পিয়ানো শিখবে সপ্তাহে তিন দিন। ছোটবেলায় শিখেছিল অনেকটা। তবে, এ সব শিক্ষাই তার আত্মসুখের জন্য। কুহু লেখকও হতে চায় না, বাইরে কোথাও পিয়ানোও বাজাবে না। সাহিত্যের আলোচনা তার ভাল লাগে, যেমন ভাল লাগে পিয়ানো কনসার্ট।

কিছু কিছু জায়গায় বেড়াতেও হবে।

সেদিন এরিকা জঙ্গের কবিতায় মাচুপিচু আর ইনসাদের কথা শুনে মনে হয়েছিল, ওখানে একবার ঘুরে এলে হয়। কুহু কখনও কোথাও একা যায়নি। বিয়ের আগে বান্ধবীদের সঙ্গে, তার পর বাচ্চাদের ছাড়া কোথাও যাওয়ার প্রশ্নই ছিল না। ওদের জন্মের আগে প্রদীপের সঙ্গে তিন সপ্তাহ ঘুরেছিল মিডল ইস্টে, বাগদাদে কী ভাল লেগেছিল। হায় বাগদাদ, সে শহরটার এখন কী অবস্থা, ধ্বংস হয়ে গেল প্রায়। প্রতিদিন গাড়িবোমায় কত মানুষ মরছে। আমেরিকানরা সেখানে গুণ্ডামি করতে গিয়ে সারা পৃথিবীর সন্ত্রাসবাদীদের খেপিয়ে তুলেছে। ইরাক যুদ্ধেরও আগে নিউ ইয়র্কের অত বড় বড় দুটো ট্রেড সেন্টার এক দিনে ধ্বংস হয়ে যাবে, তা কি কেউ কখনও স্বপ্নেও ভেবেছিল?

সেবারে ইস্তানবুল শহরটায় যাওয়া হয়নি, ও রকম শহর পৃথিবীতে আর নেই। একই শহরের অর্ধেকটা এশিয়ায় আর বাকি অর্ধেক ইউরোপে। এ বার ওখানে যেতেই হবে।

কুহু মনে মনে কল্পনা করতে লাগল, একটা পাঁচতারা হোটেলের কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চেক-ইন কর্মচারীটি তার পেছন দিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করছে, অ্যালোন? তার দু' চোখে বিস্ময়। একজন ভারতীয় নারী একা হোটেলে থাকতে এসেছে, সে আগে কখনও দেখেনি। কুহুর পাসপোর্ট আমেরিকান, কিন্তু চেহারায় ভারতীয়ত্ব মুছে যাবে কী করে? কেউ কেউ অবশ্য তাকে মেক্সিকান বলে ভুল করে।

এই শরীরটা নিয়ে কী হবে?

মাঝে মাঝেই কুহু তীব্রভাবে শরীরের দাবি অনুভব করে। যৌন স্বাধীনতাও নারী স্বাধীনতার অঙ্গ। তবে নারীবাদীরা যাই-ই বলুক, খানিকটা অন্তত মনের মিল না হলে কোনও পুরুষকে শয্যাসঙ্গী করে নিতে সে রাজি নয়।

এ দেশে ওয়ান নাইটস স্ট্যান্ড কথাটা খুব চালু হয়েছে। হঠাৎ দু'জন নারী-পুরুষের আলাপ হল, কিছুক্ষণ পর তারা খুলে ফেলল জামা-কাপড়। পরের দিন হয়তো তাদের আর দেখাই হবে না। এটাও এক ধরনের স্বাধীনতা ঠিকই, সামাজিক নৈতিকতার প্রশ্ন নেই, কিন্তু রুচির অভাব মনে হয় না? এই ধরনের সম্পর্কে কুহুর শরীর সাড়া দেবে না। তা হলে কি সে যৌবনে যোগিনী হবে? ধ্যাৎ!

প্রদীপের সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্কের কোনও সমস্যা ছিল না। হি ইজ জেন্টল, ভেরি কেয়ারিং, সেই সঙ্গে তার আবেগ ও উষ্ণতাও কম নয়। একটা সুন্দর সংসার গড়ে তুলেছিল দু'জনে। হঠাৎ গত মাস ছয়েক ধরে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল, কুহুর শরীর সম্পর্কে সব আকর্ষণ হারিয়ে ফেলল প্রদীপ। একবার মিসক্যারেজ হল কুহুর। পৃথিবীর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মেয়েরই একবার না একবার মিসক্যারেজ হয়। তাতে আবার স্বাভাবিক জীবনযাপনে কোনও বাধা হয় না।

কুহুর কোনও জটিলতা হয়নি, শরীরেও কোনও খুঁত হয়নি। তবু কী হল প্রদীপের? রাত্তিরে বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে থাকা, কথা বলতেও যেন ক্লান্ত বোধ করব সে।

একদিন কুহু স্বল্প পোশাকে নিজেই প্রদীপকে আদর করতে শুরু করেছিল। সেদিন তার ইচ্ছে করেছিল খুব।

ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস নামে একজন ইংরেজ লেখক এক সময় অভিযোগ করেছিল, ভারতীয় নারীরা সবাই প্যাসিভ, তারা যৌন জীবনে নিজেরা কোনও অংশ গ্রহণ করে না। তারা শুয়ে থাকে, পুরুষদের দায়িত্ব নিতে হয় তাদের শরীর জাগাবার, যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম পুরুষরাই করে। কুহুর ঠাকুমা-দিদিমাদের আমলে হয়তো এটা সত্যি ছিল, এখনকার মেয়েরা তা নিশ্চয়ই নয়।

কুহু খানিকটা আদর করলেও প্রদীপ বিশেষ সাড়া দিচ্ছিল না। একটু বাদে প্রদীপ কাতর ভাবে বলল, আমার আজ আর ভাল লাগছে না, কুহু। বড্ড মাথা ধরে আছে।

কুহু থমকে গিয়েছিল। মাথা ধরা? সবচেয়ে এলেবেলে অজুহাত। মাথা ধরা আবার অসুখ নাকি, ওষুধ খেলেই তো কমে যায়। প্রদীপ নিজেই তো টাইলেনল খায় যখন তখন। এ তো স্পষ্ট তাকে প্রত্যাখ্যান। অপমানে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল কুহুর মুখ।

বাথরুমে গিয়ে সেদিন অনেকক্ষণ কেঁদেছিল কুহু। যে মেয়ে বাচ্চা বয়েস থেকেই সহজে কাঁদে না, সে কাঁদছিল একা একা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

সেদিনের পর থেকে কুহু অপেক্ষা করছিল, কবে প্রদীপের মাথা ধরা থাকবে না, সে নিজে থেকে কুহুকে আদর করতে চায় কি না, কিংবা আগের দিনের প্রত্যাখ্যানের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে কি না! সে রকম কোনও লক্ষণই দেখা গেল না, বরং প্রদীপ যেন আরও উদাসীন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।

তখনই কুহু বুঝে গেল, তাদের সম্পর্কের মধ্যে একটা গভীর ফাটল সৃষ্টি হয়েছে, এ ফাটল আর জোড়া লাগবে না। শুধু শুধু অন্যদের সামনে এক সুখী দম্পতির ফাসাড রাখা তো ভণ্ডামি। তাদের দু'জনেরই যা বয়েস, শরীরের সমস্ত ক্ষমতাই তখন তুঙ্গে, প্রদীপের যদি কোনও শারীরিক অসুবিধে হয়ে থাকে, সে কথা সে তার স্ত্রীকে জানাবে না?

তার পর তো প্রদীপ স্বীকারই করল, সে অন্য একজনের সঙ্গে অ্যাফেয়ারে জড়িয়ে পড়েছে। এনাফ ইজ এনাফ, চরম সিদ্ধান্ত নিতে আর দেরি করেনি কুহু।

চোখ বুজে বসে রইল সে কিছুক্ষণ।

এই নতুন জীবনে কুহু কিছুই ছাড়বে না। তবে এরিক জঙ্গদের মতন নির্বিচারে শরীর-সঙ্গী খুঁজে নেওয়াতেও সে বিশ্বাস করে না। শিল্পী-সাহিত্যিক-গায়করা নিজেদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, অনেক সামাজিক নিয়মই তারা মানে না, যদিও সমাজজীবনের অনেক সুযোগ-সুবিধেও তারা নেয়। তার বদলে তারা সমাজকে অনেক কিছু দেয়ও তো বটে, নতুন নতুন চিন্তা, নতুন নতুন সৃষ্টি, যা নিয়ে এগিয়ে যায় মানুষের সভ্যতা। তাদের এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সঙ্গে আত্মক্ষয় আর যৌনতার বাড়াবাড়ির বোধ হয় কিছু একটা সম্পর্ক আছে, তার ঠিক ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় না। এ দেশেই এ রকম বেশি শোনা যায়, ইন্ডিয়াতেও কি এ রকম হয়? হবে না কেন। রবিশঙ্কর, ক'টা বিয়ে আর ক'টা অ্যাফেয়ার?

কুহু শিল্পী নয়, ওই পথ তার নয়। সে কিছুতেই ভালবাসার ওপর বিশ্বাস হারাবে না। হৃদয় উন্মুক্ত রাখতে হবে ভালবাসার জন্য।

বারান্দা থেকে উঠে গিয়ে কুহু অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল। আজ আর শাড়ি পরল না, জিনস আর টপের ওপর একটা লাল রঙের সোয়েটার।

শীত পড়তে শুরু হয়েছে। অনেক গাছের পাতা লাল হয়ে যাবার পর এখন ঝরার পালা। এখনও নিউ হ্যামশায়ারের দিকে গেলে ফল কালার দেখা যেতে পারে।

লিন্ডা এখনও ফোন করেনি। কিছু একটা ব্যাপার নিয়ে সে খুব ব্যস্ত মনে হল, দেখা যাক আর কয়েকটা দিন। লিন্ডার তিনটি সন্তান, অথচ তার জীবনে কোনও পুরুষ নেই। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেও মেয়েদের এ অবস্থা, এই স্বাধীনতার কথা ভাবাই যেত না।

দরজা খুলে বেরুতে যাবে, এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোন। থমকে গেল কুহু।

বাড়ির লাইনে কে ফোন করবে? মাসের পর মাস অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে এই ফোন। মা আর ছেলেমেয়েরা কুহুর সেল ফোনেই কথা বলে।

ধরবে কি ধরবে না? একটু দ্বিধা করেও কুহু ফিরে এল দরজা থেকে। ফোনের আওয়াজে একটা অজ্ঞাত বার্তার টান থাকে।

কুহু হ্যালো বলতেই শোনা গেল একটা হাসির শব্দ, তার পর একজন বলল, তা হলে ঠিকই পেয়েছি। কোথায় ফাঁকি দিয়ে থাকবে?

খুবই অবাক হয়ে কুহু বলল, ইউসুফ? তুমি এই নম্বর কী করে পেলে?

ইউসুফ বলল, সেটাই কি বেশি ইম্পর্ট্যান্ট হল? আমি যে তোমাকে পেয়েছি, সেটাই কি বড় কথা নয়! একটা ছোট্ট পাখি আমাকে এই নাম্বারটা বলে দিল।

কুহু বলল, তাই? বেশ, সেই ছোট্ট পাখিটাকে এখন দানা-পানি খাওয়াও। আমি ব্যস্ত আছি, আমি বেরুচ্ছি।

শোনো, শোনো। তুমি এখন ব্যস্ত থাকলেও তোমার সঙ্গে কখন দেখা করা যায় বলো তো? আমার বিশেষ দরকার আছে।

স্যরি ইউসুফ। দেখা করা সম্ভব নয়।

কেন সম্ভব নয়? এটা কি সমুদ্র লঙ্ঘনের মতন কোনও কঠিন কাজ?

তোমার সঙ্গে আমার তো কোনও দরকার নেই। তোমার দরকারের কথা শুনে আমি কী করব? সেদিন তোমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, তুমি আমাকে একটা পার্টিতে নিয়ে গেলে, আমার ভাল লেগেছিল, থ্যাঙ্কস! তার পর তুমি আর তোমার বন্ধুরা আমাকে এত দূরে পৌঁছে দিয়ে গেলে, থ্যাঙ্কস এগেইন। অ্যান্ড দ্যাটস দ্যাট। তুমি তোমার জীবন নিয়ে থাকো, আমি আমার জীবন নিয়ে থাকি। আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেছে।

কুহু, রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে, আমার এ পথ তোমার পথের থেকে, গেছে বেঁকে গেছে বেঁকে, আমার এ পথ। আবার রবীন্দ্রনাথেরই আর একটা গান আছে, এ পথে আমি যে গেছি বার বার, ভুলিনি তো একদিনও, আজ কি ঘুচিল চিহ্ন তাহার।

ইউসুফ, রবীন্দ্রনাথ অনেক গান লিখেছেন, অ্যান্ড আই অ্যাম সিওর, পথটথ নিয়েও অনেক কিছু লিখে থাকবেন, তা নিয়ে আলোচনা করার সময় আমার নেই।

তা হলে কখন দেখা হচ্ছে তোমার সঙ্গে?

কী আশ্চর্য, বললাম না, দেখা হবে না। বাংলা ভাষা বুঝতে পারছ না?

তোমাদের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংটার নাম তো স্পিং ফিল্ড তাই না? তোমার অ্যাপার্টমেন্ট নম্বর কত?

এবার তুমি সত্যিই ছেলেমানুষের মতন কথা বলছ। আমি বলছি আর দেখা হবে না, তবু তুমি...। প্লিজ আর ফোন কোরো না, আমার অ্যাপার্টমেন্টেও আসার চেষ্টা কোরো না।

তবু দেখা হবেই কুহু।

কুহু ফোন রেখে দিল।

না, পুরনো জীবনের কোনও জের আর টানতে চায় না সে। ইউসুফ আশা করি আর কোনও পাগলামি করবে না।

নীচে নেমে সে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, আজ সে প্রকৃতি দেখতে যাবে।

গাড়ি চালাতে ভালবাসে কুহু, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চালালেও তার ক্লান্তি নেই।

এখানকার অনেক বাঙালি মেয়ের মুখেই কুহু শুনেছে যে গাড়ি চালাবার নামই স্বাধীনতা। সেই জন্যই দেশে ফিরতে ইচ্ছে করে না। দেশে সচ্ছল পরিবারের মেয়েদের চলাফেরার জন্য পুরুষদের ওপর নির্ভর করতে হয়। স্বামী অথবা ড্রাইভার।

দেশেও তো কিছু কিছু মেয়ে এখন গাড়ি চালায়। পারসেন্টেজ খুবই কম, এখানে সব পরিবারেই দুটি গাড়ি অন্তত, মেয়েরা যখন ইচ্ছে শপিং করতে যায়।

কাজের জন্য কুহু একা একা অনেক গাড়ি চালিয়েছে, বেড়াতে যাবার জন্য এই প্রথম।

নিউ হ্যামশায়ারে একটা রেস্ট এরিয়ায় ঢুকে পড়ল কুহু। সাইট সিয়িং-এর জন্য আরও বেশ কয়েকটি গাড়ি এসেছে। দু' পাশে যত দূর চোখ যায়, বিশাল উপত্যকা, পুরোপুরি জঙ্গলে ঢাকা। এখনও অনেক গাছের পাতা রক্তিম। লাল অরণ্য, এ রকম তো ইন্ডিয়ায় দেখা যায় না। প্রকৃতির কী বিচিত্র খেয়াল।

শীত এসে গেল বলে। দীর্ঘকালীন তীব্র শীত। আজই আবহাওয়ার খবরে বলেছে যে এ বছর অনেক আগে আগে তুষারপাত শুরু হবে। যে কোনও দিন।

অন্য যারা এসেছে, গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। কুহু একা। কোনও সুন্দর দৃশ্য দেখলে পাশের কারওকে জানাতে ইচ্ছে করে। একা একা বেড়াবার এই একটা ড্র ব্যাক। খুব কাছেই দুটো কাঠবেড়ালি একজন আর একজনকে তাড়া করছে, তর তর করে উঠে যাচ্ছে গাছে, যেন মাধ্যাকর্ষণকে গ্রাহ্যই করে না। ওরা কি খেলছে, না তাড়া করছে, না মিলন চাইছে? শীতকালে বেচারারা যায় কোথায়?

কার সঙ্গে কথা বলবে এ নিয়ে?

কুহু গুন গুন করে একটা বাংলা গান গাইতে লাগল অনেক দিন বাদে। সে দেশ থেকে দশ বছর বয়েসে এসেছে, তাই বাংলা সংস্কৃতি থেকে একেবারে বঞ্চিত হয়নি, আবার এ দেশের গান-বাজনাও ভালবাসে।

সে গাইছে :

সখী, ভাবনা কাহারে বলে
সখী, যাতনা কাহারে বলে
তোমরা যে বলো দিবস রজনী
ভালোবাসা ভালোবাসা
সখী, ভালোবাসা কারে কয়
সে কি এমনি যাতনাময়।

এই গানটি অকস্মাৎ কেন মনে এল কে জানে। মনের গতিবিধি বোঝা দুষ্কর।

আবহাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী মিলে গেছে, সন্ধে থেকেই শুরু হল হালকা তুষারপাত।

বাড়ি ফিরে কুহু দেখল, কম্পিউটারে দুলছে একটি বার্তা, কুহু কুহু, কুহু! আই ওয়ান্ট টু সি ইউ, আই ওয়ান্ট টু সি ইউ, আই ওয়ান্ট টু সি ইউ!

রাগ করার আগে কুহুর একটু হাসি পেয়ে গেল।

এটা ইউসুফের কীর্তি। কী করে যেন সে এই কম্পিউটারে ঢুকে পড়েছে। ও সব পারে। এক দিকে বিশিষ্ট জ্ঞানী, আর এক দিকে দারুণ ছেলেমানুষ।

ইউসুফ নিশ্চয়ই এখানকার একটা টেলিফোন ডিরেক্টারি জোগাড় করে দেখেছে, বাঙালি হিন্দু নাম ক'টা আছে। তার পর চেষ্টা করতে করতে অনীশ মজুমদারের নম্বর পেয়ে গেছে। তার জন্য কম সময় নষ্ট করতে হয়নি। পাগল আর কাকে বলে।

কুহুর ইচ্ছে করল আজ সে রান্না করবে। বছরের প্রথম তুষারপাত সেলিব্রেট করতে হবে না? সে একা একা পার্টি করবে। এর পর দিনের পর দিন তুষারপাতে নানান অসুবিধে করে গাড়ি চালাতে বিরক্তি বোধ করবে, তবু প্রথম প্রথম পৃথিবীটাকে সাদা হয়ে দেখতে পাওয়ার একটা আনন্দ আছেই। শুভ্রতা মানুষকে আকৃষ্ট করে।

বাঙালি রান্না হবে, না অন্য কিছু? ভাত, ডাল, বেগুন ভাজা, আলু ফুলকপির তরকারি আর চিংড়ি মাছ। কিংবা লাসানিয়া, মাশরুম, গ্রিল্ড সোর্ড ফিস আর আইসক্রিম। কুহুর ভাত খেতেই ইচ্ছে করছে, তা হলে চিংড়ি মাছ করতেই হবে।

ফ্রিজ থেকে চিংড়িমাছ বার করে থ করতে দিতেই কুহুর খেয়াল হল, অ্যাপার্টমেন্টে বিয়ার, ওয়াইন, হার্ড ড্রিঙ্কস জাতীয় কিছুই নেই তো। পার্টি হবে, অথচ কোনও রকম মদ্য থাকবে না, তা কি হয়? একটা কিছু বাজনা বাজবে, কুহুর হাতে পানীয়ের গেলাশ থাকবে, সে একটু একটু নাচবে, তবে তো পার্টি।

ভাত চাপাবার আগে কুহু আবার বেরিয়ে পড়ল।

কাছেই আছে একটা লিকার স্টোর, সেখান থেকে বেশ কয়েক রকম পানীয় তুলে নিল, কয়েকটা মোমবাতি কিনল সে, কিছু ন্যাপকিনও দরকার। একবার বেরুলেই এটা সেটা নেওয়ার কথা মনে পড়ে।

গাড়িটা নিজস্ব পার্কিং লটে ঢোকাতে যাচ্ছে, উল্টো দিকে একটা ছোট মতন পার্ক, সেখানকার একটা বেঞ্চ থেকে উঠে এল একটা ছায়া শরীর। ইউসুফ।

কাছে এসে সে বলল, আমি এখানে কতক্ষণ বসে আছি জান? তিন ঘণ্টা। তোমাদের এখানে বুঝি দু'দিক থেকেই গাড়ি বার করা যায়? সেটা আগে ঠিক বুঝতে পারিনি।

কুহু বলল, তুমি এখানে তিন ঘণ্টা ধরে বসে আছ?

ইউসুফ বলল, টু বি প্রিসাইজ, তিন ঘণ্টা চোদ্দো মিনিট। প্রায় এক প্যাক সিগারেট শেষ করে ফেলেছি।

বসে আছ কেন?

তোমার সঙ্গে কথা বলা যে বিশেষ দরকার। তুমি ফোন করতে বারণ করেছিলে, তাই আর ফোন করিনি।

এ রকম একটা পাতলা জ্যাকেট পরে...ঠাণ্ডা লেগে ব্রঙ্কাইটিস বাধিয়ে বসবে।

তা নিয়ে তোমায় চিন্তা করতে হবে না। কুহু, তুমি আমাকে পনেরো মিনিট সময় দেবে?

ইউসুফ, এই ধরনের সেন্টিমেন্টাল অ্যাপিল দিয়ে তুমি আমাকে নরম করে ফেলবে ভেবেছ? তোমার দরকারি কথা শোনার কোনও আগ্রহ আমার নেই। তা তো আমি বলেই দিয়েছি।

একবার বলে দিয়েছ, পরে বুঝি রি-কনসিডার করা যায় না?

নো! অ্যান্ড নো। অ্যান্ড নো! বার বার ইনসিস্ট করে ডোন্ট মেক ইট বিটার, ইউসুফ! বাই।

গট গট করে সে ভেতরে ঢুকে গেল।

এক সময় ইউসুফ তাকে ভালই চিনত। তার কি মনে নেই যে কুহু একবার জেদ ধরলে তাকে আর ফেরানো যায় না। একবার না বললে আর হ্যাঁ হয় না।

নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে দরজা লক করে দিল কুহু।

একটা মিউজিকের রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে সে শুরু করল রান্না। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে অবিশ্রান্ত তুষারপাত।

একটা বাড়ি কিনে ফেলতে হবে শিগগিরই। অ্যাপার্টমেন্টে থাকা আর

নিজের বাড়িতে থাকার মধ্যে তফাত আছে। অ্যাপার্টমেন্টে ঠিক একাকীত্ব অনুভব করা যায় না। দেওয়ালের ওপাশেই কেউ না কেউ থাকে, মাঝে মাঝেই অনুভব করা যায় না। দেওয়ালের ওপাশেই কেউ না কেউ থাকে, মাঝে মাঝেই তা টের পাওয়া যায়। এ দেশে সবাই ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে একটা বাড়ি কিনে ফেলে। তার পর যখন বুড়ো-বুড়ি হয়, তখন বাড়ি বিক্রি করে অ্যাপার্টমেন্টে চলে যায়। বাড়ি মেনটেন করা, সাফসুতরো করা তখন শক্ত হয়, অ্যাপার্টমেন্ট নিরাপদ।

এই বাড়িটাতেও বুড়ো-বুড়ির সংখ্যাই বেশি। লিফটে যাদের সঙ্গে দেখা হয়, অধিকাংশেরই বয়েস ষাট-পঁয়ষট্টির কম নয়। এ পর্যন্ত যে একটা মাত্র ব্যক্তির সঙ্গে কুহুর বেশি কথা হয়েছে, তাঁর বয়েস সত্তর-বাহাত্তর তো হবেই। বেশ প্রসন্ন মুখখানি, তবে বাচাল। হয়তো ওঁর কথা বলার কেউ নেই।

বাইরের পোশাক ছেড়ে কুহু একটা ঢোলা কাফতান পরে নিল। খুলে ফেলল একটা রেড ওয়াইনের বোতল। নির্দিষ্ট গেলাশে অনেকখানি ঢেলে নিয়ে সে হাত তুলে বলল, চিয়ার্স!

কার উদ্দেশ্যে বলল? মজার ব্যাপার। চেনা কারওর মুখ নয়, তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, ব্রাড পিট নামে অভিনেতার মুখ। কুহু যে তার খুব ভক্ত, তাও নয়।

রান্না শেষ করার পর একটুক্ষণ নাচল কুহু। সঙ্গীর দরকার হয় না, এমন নাচ। সারা ঘর ঘুরে ঘুরে। পোশাক অনেকটা উড়িয়ে। নাচ কখনও শেখেনি কুহু, তবে বাজনার সঙ্গে সঙ্গে তাল রাখা এমন কিছু শক্ত নয়।

তিন দিন পর আবার একটা সিগারেটও ধরিয়ে ফেলল।

এবার খেতে বসতে হবে। কয়েক দিন কিছু না খেয়ে বেশ ছিল, আজ রান্নার সময় হঠাৎ যেন খিদের আগুন জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। যেন খিদের বোধটা ঘাপটি মেরে লুকিয়েছিল পেটের মধ্যে কোথাও।

বড় ডাইনিং টেবলে যথারীতি একটা টেবল ক্লথ পাতল সে। বেশ শৌখিন, কারুকার্য করা। মাঝখানে জ্বেলে দিল বড় একটা মোমবাতি। ছোটবেলা খাওয়ার সময় বই পড়ত কুহু, তার মেয়ে চন্দ্রাও সেই স্বভাবটা পেয়েছে। খেতে দেরি হত বলে কুহুকে মা বকুনি দিত। কুহুও মেয়েকে বকুনি দিয়েছে কয়েকবার।

এখন কুহু একটা বই নিয়ে বসল। কাকামণির কিছু বইয়ের সংগ্রহ আছে। কাকিমা আর রুবেলের জিনিসপত্র অমিতা এসে সব গুছিয়ে নিয়ে গিয়ে দান করে দিয়েছেন স্যালভেশান আর্মিকে। ওগুলো আর রেখে দেবার কোনও মানে হয় না। শুধু শুধু স্মৃতি জাগিয়ে রাখা। কাকামণির প্যান্ট-শার্ট-কোর্ট সব রয়ে গেছে, উনি একদিন আবার সুস্থ হলে ফিরে আসবেন, এই আশায়।

অনেক খাবার হয়ে গেছে, এক জনের জন্য কি আন্দাজ করা যায়? কয়েক দিন লেফট ওভার খেতে হবে। খাওয়া শেষ হয়ে গেলেও বইটা পড়ল কিছুক্ষণ। উপন্যাসটির নাম 'বিফোর', লেখিকার নাম ইরিনি স্প্যানিডু, এর নাম আগে শোনেনি কুহু। মলাটের বিষয়বস্তু দেখেই পড়তে আগ্রহী হয়েছে। বিয়াট্রিস নামে একটি মেয়ে একা থাকে নিউইয়র্কের একটা ফ্ল্যাটে, তার জীবন, অনেকটা কুহুর সঙ্গেই তো মিলে যাচ্ছে। লেখিকার ভাষা বেশ জোরালো আর তরতর করে এগিয়ে যাওয়া যায়, তবু খানিকটা পড়ার পরই কুহুর বিরক্তি লেগে গেল, এত সেক্স, একা থাকা মানেই যৌন লাম্পট্য, জীবনের আর কোনও গভীর বোধ নেই?

এই জন্যেই নারীবাদী অনেক লেখিকা সম্পর্কে কিছু সমালোচক অভিযোগ করেছেন যে যৌন-স্বাধীনতার নামে রগরগে যৌনতার বর্ণনা দেওয়া বই লিখে তাঁরা বড়লোক হয়েছেন। মেয়েদের অসভ্য লেখা পুরুষ পাঠকরা বেশি পছন্দ করে।

আর পড়তে ইচ্ছে করল না কুহুর। উঠে সে হাত ধুয়ে নিল।

রাত্তিরেই কাজের বাসনপত্র মেজে রাখা তার অভ্যেস। এত কম বাসন যে ডিশ ওয়াশারে দেওয়ারও কোনও মানে হয় না। দেখা যাবে কাল সকালে। তাড়া তো কিছু নেই।

এখনই শুতে যাবারও কোনও মানে হয় না।

ডি ভি ডি-তে একটা সিনেমা দেখা যেতে পারে।

সবই পুরনো, তার মধ্যে থেকে কুহু বেছে বার করল 'দা বিউটিফুল মাইন্ড'। এটা কুহুর খুবই প্রিয়। রাসেল ক্রো কী অভিনয়টাই না করেছে। প্রদীপেরও এই ফিল্মটা বেশ পছন্দের। এটা আবার দেখতে ভালই লাগবে।

ডিস্কটা ঢোকাবার আগেই দরজার বেল বেজে উঠল।

ভুরু কুঁচকে গেল কুহুর। এখন কে আসবে? অন্য কোনও ফ্ল্যাটের লোকজনের সঙ্গেও তার পরিচয় নেই। দরজা খোলার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

একটা হাউস কোট চাপিয়ে নিয়ে দরজার কাছে এসে সে জিজ্ঞেস করল, হু ইজ ইট?

উত্তর এল, সুপার ম্যাম। আপনার টয়লেট থেকে জল লিক করে নীচে পড়ছে। আমি কি একবার চেক করে দেখতে পারি? ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড।

বাথরুম থেকে জল লিক করে তলায় পড়ছে? সেটা তো খুব খারাপ ব্যাপার! কুহু দরজা খুলে দিল।

কোথায় সুপার? দাঁড়িয়ে আছে ইউসুফ। ঝোড়ো কাকের মতন চেহারা, সমস্ত পোশাক জবজবে ভেজা, মাথায় কুচি কুচি বরফ।

রীতিমতন রেগে গিয়ে কুহু বলল, তুমি আবার এসেছ? কী ব্যাপার বলো তো? তোমাকে আমি এত অপমান করছি, তাও তোমার গায়ে লাগছে না? তোমার আত্মসম্মান বোধ কোথায় গেল?

ইউসুফ বলল, আমার বিশেষ কথাটা তোমাকে না বলে যে কিছুতেই যেতে পারছি না। বারবার ফিরে ফিরে আসছি।

কুহু বলল, তোমার বিশেষ কথা আমি শুনতে যাব কেন? আমার যদি কোনও আগ্রহ না থাকে, তবু তুমি জোর করে আমাকে শোনাবে?

এবার ইউসুফ গম্ভীর ভাবে বলল, তুমি এক কাজ করো। দরজাটা আমার মুখের ওপর বন্ধ করে দাও। খুব জোর আওয়াজ করে। তার পর আমি সত্যিই চলে যাব, আর আসব না।

কুহু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ইউসুফ আবার বলল, তা যদি না পারো, তা হলে ফোনে তোমাদের সিকিউরিটির লোকদের ডাকো। বলো, আমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিতে। তা হলেও আমি আর আসব না।

কুহু এবারেও কোনও কথা বলল না। কিন্তু রাগে তার শরীর কাঁপছে।

ইউসুফ বলল, সারা দিন আমি কিছু খাইনি, দারুণ খিদে পেয়েছে। কিছু পান করিনি, খুবই তৃষ্ণার্ত। তবু আমি যেতে পারছি না। আমাকে তুমি মাত্র পনেরো মিনিট সময় দিতে পারো না?

এক জন মানুষ ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, সে যদি পূর্বপরিচিত হয়, দুঃশীল না হয়, তা হলে কোনও বাঙালি মেয়ে তাকে দরজার বাইরে থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে! বাঙালি কেন, পৃথিবীর কোনও নারীই বোধহয় তা পারে না।

দরজা থেকে একটু সরে দাঁড়িয়ে কুহু বলল, ঠিক আছে, এসো—।

ইউসুফ ভেতরে আসবার পর দরজা বন্ধ করে কুহু বলল, ওইখানেই দাঁড়িয়ে থাকো। কার্পেট ভেজাবে না।

অনীশের একটা প্যান্ট, শার্ট আর জ্যাকেট নিয়ে এসে বলল, ওই দিকে বাথরুম। যাও, ভিজে পোশাক ছেড়ে এইগুলো পরো। ভিজে পোশাকগুলো একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে করে নিয়ে যাবে, এগুলো আর ফেরত দিতে হবে না। আমি তোমার জন্য খাবার গরম করছি।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে ইউসুফ উৎফুল্ল ভাবে বলল, দ্যাখো, বেশ ভাল ফিট করেছে। এগুলো কার, প্রদীপদার তো নয়। প্রদীপদা আমার থেকে লম্বা। একটা চিরুনি পেলে ভাল হত।

অন্য প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কুহু বলল, বাথরুমে যে আয়নাটা আছে, সেটা সরাও, তিন-চার রকম চিরুনি পাবে।

ইউসুফ আবার ফিরে আসার পর কুহু বলল, এখানে এসে খেয়ে নাও।

প্লেট সাজাবার পর কুহু জিজ্ঞেস করল, তুমি কোনও ফ্রুট জুস নেবে? কিংবা খানিকটা রেড ওয়াইনও আছে।

ইউসুফ বলল, দুটোই নেব।

বুভুক্ষুর মতন খেতে লাগল ইউসুফ। যেন বহুকাল তার খাওয়া জোটেনি। প্রত্যেকটা পদ তারিয়ে তারিয়ে খেল। মাঝে একবার শুধু জিজ্ঞেস করল, নিউ জার্সির সবাই জেনে গেছে, তোমার আর প্রদীপদার মধ্যে কী যেন হয়েছে। কী হয়েছে বলো তো? প্রদীপদা ইজ সাচ আ নাইস জেন্টলম্যান।

কুহু কঠোরভাবে বলল, আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না। ইউ বেটার নট আস্ক সাচ কোয়েশ্চেন।

ইউসুফ বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর এক হাত ভাত দেবে? আর একটু ডাল। ডালটা যা হয়েছে না, সুপার্ব। আমি চিংড়ি মাছ খাই না।

খাওয়া শেষ করার পর ইউসুফ তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে জিজ্ঞেস করল, এবার তো একটা সিগারেট খেতেই হয়। এখানে অ্যালাউড?

কুহু বলল, সামনে একটা ঢাকা বারান্দা আছে, সেখানে বসে খেতে পারো।

ইউসুফ বলল, ওখানে গিয়ে তা হলে একটা সিগারেট খাই। তুমি আমার পাশে গিয়ে বসবে?

কুহু বলল, হ্যাঁ বসব। কিন্তু তার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আমি যে এখানে একা থাকি, তা তুমি জানতে?

ইউসুফ বলল, হ্যাঁ, সেটা তো জানা হয়েই গিয়েছিল। প্রদীপদা থাকলে কি অসময়ে এই ভাবে আসা যেত?

কুহু বলল, শোনো ইউসুফ, নো হ্যাঙ্কি প্যাঙ্কি বিজনেস! সিঙ্গল উয়োম্যান দেখলেই পুরুষদের মাথায় একটা দৈত্য চেপে বসে। তাই না?

একটু ক্ষুণ্ণ ভাবে ইউসুফ বলল, কুহু, তোমার সঙ্গে টানা এক বছর আমি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছি, তুমি আমার অ্যাপার্টমেন্টেও এসেছ দু'একবার। আমি কখনও তোমার ওপর জোর করেছি? কখনও অসংযত ব্যবহার করেছি?

কুহু বলল, তা করোনি। কিন্তু তার পর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে, তুমি কতটা বদলে গেছ তা জানব কী করে? হোয়াট এভার, তুমি যে একটা বিশেষ কী যেন কথা ডেসপারেটলি আমাকে বলতে চাও, সেটা আমি এখন শুনব, কিন্তু আমার কাছ থেকে কিছু আশা কোরো না। আর তোমার কথা বলা হলে তুমি চলে যাবে।

ইউসুফ বলল, দেখো, বাইরে এখনও বরফ পড়ছে, এর মধ্যে তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাও?

কুহু তার উত্তর না দিয়ে বলল, নাউ শুট, অ্যান্ড প্লিজ মেক ইট শর্ট।

ইউসুফ বলল, আই ও ইউ অ্যান অ্যাপোলজি। বিফোর দ্যাট আই মাস্ট এক্সপ্লেন, না, আমি বাংলাতেই বলি। বাচ্চাদের বাংলা শেখাবার জন্য সানডে স্কুল করেছি, অথচ নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময়ও এত ইংরিজি... কুহু, তোমার কাছে আমার একটা কৈফিয়তের ঋণ আছে। আমরা পরস্পরকে পেতে চেয়েছিলাম, মাঝখানে ধর্মীয় বাধা, মাকে বোঝাবার জন্য ঢাকায় গেলাম, মা কিছুতেই মানতে চাইলেন না, কান্নাকাটি করতে লাগলেন, আমি, মানে, এক দিকে মা, অন্য দিকে তুমি, এতই দুর্বল হয়ে গেলাম, তোমাকেও কিছু জানাতে পারিনি।

তাকে বাধা দিয়ে কুহু বলল, বেশি ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না। আমি বুঝেছিলাম, মাকে দুঃখ দেওয়া ঠিক নয়। তুমি আমাকে কিছু জানাওনি, লজ্জা পেয়েছিলে, দ্যাট ইজ অলসো আন্ডারস্ট্যান্ডেব্‌ল! এসব তো কবেই চুকে বুকে গেছে ইউসুফ—

ইউসুফ বলল, তার পর তো আমি হুড়মুড় করে বিয়ে করে ফেললাম। সে বিয়েটা বেশি দিন টিকল না দুটি কারণে। প্রথমটিই আসল কারণ, তবু দ্বিতীয়টাই আগে বলি। কুলসম মেয়েটা ভাল ছিল, নম্র, স্বল্পভাষী, আমাদের পরিবারের সঙ্গে বেশ মানিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু কয়েক দিন পরে আমি রিয়েলাইজ, মানে উপলব্ধি করলাম, তার সঙ্গে কথা বলা খুব শক্ত। ধর্মে মুসলমান হলেই কি সব ব্যাপারে মিল হতে পারে? আমরা ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, শামসুর রাহমানে মুগ্ধ, সে এসব কিছুই জানে না। জানার আগ্রহও নেই। আমি উর্দুও পড়েছি, সে যদি গালিব, ইকবাল কিংবা ফয়েজ আহমদ ফয়েজ সম্পর্কে কথা বলত, আমি তাতেও যোগ দিতে পারতাম। কিন্তু সে এ সবের ধার ধারে না। এক দিন আমি কথায় কথায় মান্টোর একটা গল্পের রেফারেন্স দিয়েছিলাম, কিন্তু সে মান্টোর নামও শোনেনি। সুতরাং এটা ঠিক ভাষার তফাতের জন্য না—

কুহু বলল, সবাইকে কি সাহিত্য জানতেই হবে? তা না জেনেও অনেকে ভালভাবে জীবন কাটাতে পারে।

ইউসুফ বলল, তা ঠিক। আমার মা-ও তো কবিতাটবিতা পড়তেন না। কিন্তু মা হচ্ছে মা। কিছু না কিছু সাংস্কৃতিক মিল তো থাকা দরকার। মাঘ মাসে বৃষ্টি হলে মা বলতেন, যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্যি রাজার পুণ্য দেশ। কিংবা বলতেন, চক্ষের পানি, দরিয়ার পানি, কোনটা বেশি, কোনটা কম,

কিছুই না জানি। এই সব শুনলে হৃদয়ের তন্ত্রীতে কোথাও না কোথাও একটু ঝংকার লাগেই। কুলসমের ওপর আমার মায়া হত, তাকে একটা ভুল পরিবেশে এনে ফেলা হয়েছিল।

কুহু বলল, লখনউ-এর মেয়ে বাংলাদেশে... ওকে এদেশে নিয়ে এলেই অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারত হয়তো।

ইউসুফ বলল, এবারে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রথম কারণটা বলি? সে কারণটা হচ্ছে তুমি!

আমি! হাউ কাম?

তোমার সঙ্গে আমার মিলন হল না, তবু তুমি সর্বক্ষণ উপস্থিত রইলে আমার আর কুলসমের মাঝখানে।

এটা একটা অদ্ভুত কথা।

মোটেই অদ্ভুত নয়, একেবারে সত্যি কথা।

এটা তোমার একটা মনের বিকার, ইউসুফ। এ জন্য আমি কেন দায়ী হতে যাব?

কুলসমের সঙ্গে মিলিত হতে গেলে সবসময় মনে পড়ত তোমার মুখ, আর ইয়ে, তোমার শরীর। এটা কি কুলসমের প্রতি অবিচার নয়?

নিশ্চয়ই! অবিচার তো বটেই। কেন সে মেয়েটিকে কষ্ট দেবে!

শুধু ও একাই কষ্ট পায়নি। আমি? আমি তো কিছুতেই ওকে, আমি তোমাকে পাইনি, সেই অতৃপ্ত বাসনা দিন দিন আরও তীব্র হচ্ছিল, তুমি যাকে বললে মনের বিকার, সেটারই আর এক নাম বোধহয় ভালবাসা।

এবার কুহু হাসল। হাসতে হাসতেই বলল, ভালবাসা! কী জানি! ভালবাসার যে কত রকম নাম, আবার ভালবাসার নামে অন্য কিছুও হলো। ওয়েল, এর মধ্যে চোদ্দোটা বছর কেটে গেছে, এখন আর এসব কথা তুলে লাভ কি? আজকেই আমাকে এসব কথা জানাতে হবে, এমন কী জরুরি ব্যাপার, তা তো বুঝতে পারছি না।

ইউসুফ বলল, কুহু, তোমার সুখী দাম্পত্য জীবনের কথা অনেকের কাছে শুনেছি, তাই কোনও দিন তোমাকে বিরক্ত করতে যাইনি। দূর থেকে তোমার খবর রাখতাম। এখন তোমাদের কিছু একটা হয়েছে, প্রদীপদার থেকে তুমি আলাদা থাকছ, যদি তোমাদের আবার মিটমাট হয়ে যায়, আমি সেটাই চাইব। আর যদি একেবারেই বিচ্ছেদ হয়, তা হলে, মানে, তুমি অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার আগেই আমি আমার দাবি জানিয়ে রাখতে চাই। আমরা আমাদের পুরনো সম্পর্ক ফিরে পেতে পারি না?

কুহু গম্ভীর ভাবে বলল, শোনো, এই কথাটা খুব ভাল করে মন দিয়ে শোনো। প্রদীপের সঙ্গে আমার কী হয়েছে, তা নিয়ে আমি আলোচনা করব না। তবে, একটা ব্যাপার আমি একেবারে ঠিক করে ফেলেছি। আমি আর কোনও পুরুষের সঙ্গে জীবনটা জড়াব না। ইমোশানালি, ফিজিক্যালি, কোনও ভাবেই না। আমি স্বাধীন ভাবে থাকব। এটা আমার ফাইনাল কথা। ইউসুফ, আমি আর অতীতকে টেনে আনতে চাই না। এর পরেও তুমি যদি আমাকে ওই একই কথা শোনাতে আসো, তাহলে আমাদের সম্পর্কটা তিক্ত হয়ে যাবে।

ইউসুফ আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, এটা তোমার ফাইনাল কথা? তাহলে আমার আর একটা দাবি আছে, তুমি আমাকে মুক্তি দাও।

হোয়াট!

হে দেবী, আমি তোমার কাছ থেকে মুক্তি চাইছি।

হোয়াট ডু ইউ মিন? মুক্তি আবার কী? আমি তোমাকে মুক্তি দেবার কে?

তুমি যে আমাকে বন্দি করে রেখেছ অতৃপ্ত বাসনায়। তার থেকে বেরোতে পারছি না। অন্তত একবার আমাদের ইয়ে, মিলন না হলে, প্লিজ কুহু, আমরা দু'জনেই পরস্পরকে চেয়েছিলাম একসময়...। একালের একজন কবি লিখেছেন না, 'লিবিডো প্রবল, তাই বাকি রয়ে গেল অর্ধরতি!' আমার যে সবই বাকি রয়ে গেছে।

ফের ওই প্রসঙ্গ তুলো না। মুক্তি ফুক্তি আমি গ্রাহ্য করি না। এটা কি সিডিউস করারই অন্য নাম? মিলন? নো ওয়ে। আমি ক্যাজুয়াল সেক্সে একদম বিশ্বাস করি না।

উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, যদি ফিরে যেতে না চাও, দরজার পাশেই যে ঘর, সেখানে শুয়ে থাকতে পারো—। আমার ঘরের দরজা আমি লক করে রাখব। রাত্তিরে আর কোনও রকম নষ্টামি করার চেষ্টা করবে না বলো? ইউ প্রমিজ

ইউসুফও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আই প্রমিজ। সংস্কৃতে একটা কথা আছে, কবিতা বনিতা চৈব সুখদা স্বয়মাগতা। কবিতা যেমন জোর করে লেখা যায় না, তেমনি কোনও নারীও স্বয়মাগতা না হলে

তাকে থামিয়ে দিয়ে কুহু বলল, আর বলতে হবে না। যাও শুয়ে পড়ো, গুড নাইট।

ইউসুফ বলল, সখী, শুধু একবার অন্তত একটি চুম্বন

সে কুহুকে হঠাৎ জড়িয়ে ধরল।

তাকে কুহু ঠেলে সরিয়ে দেবার আগেই ইউসুফ নিজে থেকেই সরে গিয়ে অনুতপ্ত গলায় বলল, সরি, ভুল করে ফেলেছি। এরকম আর হবে না, প্লিজ, ফরগিভ মি।

কুহু বলল, ইউ বেটার রিমেমবার দ্যাট। গুড নাইট এগেইন।

সে দ্রুত পায়ে চলে গেল নিজের ঘরে।

ড্রেসিং টেবলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে হাঁপাতে লাগল।

তার শরীর কাঁপছে। ধকধক করছে বুকের মধ্যে। এ রকম হচ্ছে কেন? ইউসুফের কয়েক মুহূর্তের স্পর্শেই তার শরীরের তাপ এসে গেছে। কত কাল পরে এক জন পুরুষের আলিঙ্গন। তার শরীর কি এ জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল।

তার শরীরের তাপ ক্রমশ বাড়ছে। তার ঠোঁটের খুব কাছে ঠোঁট এনেছিল ইউসুফ। জোর করেনি, নিজেই সরে গেছে।

দরজা লক করে রাখলে ইউসুফ আর ভেতরে আসতে পারবে না। খুব জোরে দরজা ধাক্কাধাক্কিও করবে না ইউসুফ, সেটা তার স্বভাবে নেই, জানে কুহু।

কেন সে ইউসুফকে ধমক দিল? একটা চুম্বনে কী ক্ষতি হত? পুরোপুরি মিলন হয়নি কখনও, কিন্তু ইউসুফের সঙ্গে কয়েকবার চুম্বন বিনিময় তো হয়েছে এক সময়।

সদ্য পরিচিত কেউ নয়, পুরনো প্রেমিকের সঙ্গে একবার মিলন হলে কি তাকে ক্যাজুয়াল সেক্স বলা যায়? একবার মিলন হলে কী ক্ষতি হয়? কিছুই না, শরীর তো একই থাকে। নিজের বুকে হাত রাখল কুহু। ঢেউ ফেলেছে বুকের মধ্যে।

কুহু স্পষ্ট বুঝতে পারল, তার শরীর চাইছে আলিঙ্গন। অথচ একটা

দ্বিধাও কাজ করছে। প্রদীপ ছাড়া আর কোনও পুরুষের সঙ্গে এ পর্যন্ত শারীরিক সম্পর্ক হয়নি কুহুর। সেই জন্যই দ্বিধা। সতীত্ব নামে একটা বদ্ধমূল কুসংস্কার বহু কাল ধরে পুরুষরাই তো ঢুকিয়ে দিয়েছে মেয়েদের মাথায়। পুরুষদের নিজেদের বেলায় সে রকম কিছু নেই। পুরুষরা বাইরের জীবনে অন্য মেয়েদের সঙ্গে কী করছে, তা তার ঘরের মেয়েটি কি জানতে পারে? জানতে পারলেও তো মেনে নিতে বাধ্য হয়।

শরীর নিয়ে নিজে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারই তো নারী-স্বাধীনতার প্রাথমিক শর্ত। প্রদীপ অন্য মেয়ের সঙ্গে অ্যাফেয়ার করবে, আর সে নিজের শরীরকে বঞ্চিত করে রাখবে?

এই সব চিন্তা অতি দ্রুত খেলে গেল কুহুর মাথায়। আর শরীরের ছটফটানি বাড়ছে। অনেক দিন পর তার শরীরের মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে বিদ্যুৎ।

ইউসুফকে সে একসময় ভালবেসে ফেলেছিল, সে ভালবাসা কি মরে গেছে একেবারে?

আর কিছু ভাবতে পারল না কুহু। ঝট করে সে হাউস কোটটা খুলে ফেলে চলে এল অতিথি ঘরে। শুয়ে পড়েনি, বিছানার ওপর বসে আছে ইউসুফ।

সোজা গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে কুহু বলল, ইউসুফ, তুমি একটা চুমু খেতে চেয়েছিলে। এই নাও—

॥ ৭ ॥

মার্কিন দেশটাও মাটির, নয়কো সোনা রুপোর

অনীশকে সকালের চা-টা দিয়ে এসে অমিতার হঠাৎ মনে হল, আমি যদি হঠাৎ মারা যাই, তা হলে এ বাড়ির পুরুষ দু'জনের কী হবে?

অনীশ নিজের জন্য কিছুই করতে পারে না। তাকে খাবার না দিলে খাবে না, ওষুধ না দিলে ওষুধের কথা মনেও থাকবে না। সত্যিই কি সে কিছু পারে না? পরীক্ষা করে দেখার জন্য অমিতা এক দিন তাকে বললেন, অনীশ, আমার শরীরটা আজ ভাল লাগছে না, আজ তুমি চা-টা বানিয়ে নেবে? আমাকেও একটু দিও।

এ কথা শুনে বাধ্য ছেলের মতন টিভি'র সামনে থেকে উঠে এসে অনীশ জল গরম করতে দিল। চিনি, দুধ, টি ব্যাগ সব সামনেই রাখা, দুটি কাপ সাজিয়ে ফেলল অনীশ।

তার পর এক সময় জল গরম হয়ে গেল, হুইসলিং কেটলে শব্দ হতে শুরু করল, তবু সেদিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল অনীশ। শব্দটা ক্রমশ বাড়ছে, কানে তালা লেগে যাবার মতন বিরক্তিকর, তাও অনীশের কোনও হুঁস নেই। ওপরে উঠে গিয়েছিলেন অমিতা, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তিনি বললেন, অনীশ, জল হয়ে গেছে, গ্যাসটা বন্ধ করে দাও। তাতেও অনীশের হেলদোল নেই, দাঁড়িয়েই রইল চুপ করে।

আর একটা কেটলি আছে, শব্দ হয় না, শুধু একটা লাল আলো জ্বলে,জল ফুটে গেলে নিভে যায়। সেটা দিয়েও কোনও লাভ হবে না। লাল আলোটা কখন জ্বলল, নিভল, খেয়ালই করবে না অনীশ।

এই তো অবস্থা।

অমলেশের স্বভাবও প্রায় এ রকমই। একটু আধটু রান্না জানেন তিনি, কিন্তু পারতপক্ষে রান্না ঘরে ঢুকতেই চান না। হাতে একটু সময় পেলেই বাড়ির টুকিটাকি সারাইয়ের কাজ কিংবা বাগানের কাজ করবেন, রান্নাটান্না সব অমিতার ডিপার্টমেন্ট। খেতে না ডাকলে খাওয়ার কথা খেয়ালই থাকে না।

অমিতার মাঝে মাঝে মনে হয়, টানা দু'তিন দিন চা-কফি কিংবা লঞ্চ-ডিনার কিছুই না দিলে কী করবে এই পুরুষ দু'জন? খিদে তেষ্টা তো পাবেই। সেই পরীক্ষাটা অবশ্য কার্যকর হয়নি এখনও।

মৃত্যুচিন্তা তো মাঝে মাঝে আসবেই। মাঝে মাঝেই জ্বর হচ্ছে অমিতার। ওষুধ খেলে কমে, আবার ফিরে ফিরে আসে। ডাক্তারের মতে, জ্বর কোনও অসুখ নয়, একটা সিম্টম, কিন্তু পরীক্ষা করেও অন্য কোনও রোগের সন্ধান যখন পাওয়া যায়নি, তাই চিন্তা করার কিছু নেই। তবু, কেন জ্বর বারবার ফিরে আসছে, তা নিয়ে চিন্তা হবে না? দিন দিনই অমিতার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে, অন্য কোনও একটা কঠিন রোগ হঠাৎ হুড়মুড় করে এসে পড়বে, তখন আর বাধা দেবার কোনও উপায় থাকবে না। আজও জ্বর এসেছে বেশ।

পৃথিবীটা ঠিকঠাকই থাকবে, অথচ অমিতা নেই, এই অবস্থাটা তিনি এখনও কল্পনা করতে পারছেন না।

এই সংসারটার অবস্থাই বা কী হবে?

তার পরেই মনে পড়ে, কুহু নেই, ছেলে-আর মেয়েও কাছে নেই, প্রদীপ একা একা থাকছে কী করে! কুহুও তো থাকছে একা একা, কিন্তু তার জন্য এই চিন্তা হয় না। যে-কোনও অবস্থায় কুহু নিজেকে ঠিক সামলে নিতে পারে। একবার একটা পার্কে কুহু মাগারদের পাল্লায় পড়েছিল, তারা কিন্তু কুহুর হাতের ব্যাগটা কিছুতেই কেড়ে নিতে পারেনি। কুহু এমন দৌড় লাগিয়েছিল! কত স্পোর্টসে কুহু প্রাইজ পেয়েছে।

প্রদীপের বাস্তবজ্ঞান খুবই কম। রান্নাটান্না হয়তো কোনও ক্রমে সামলে নেবে, কিংবা বাইরে খাবে, কিন্তু বাড়ির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, এমনকী ব্যাঙ্ক-ইনসিওরেন্সের কাগজ, কিছুই সে খুঁজে পায় না। সব কুহু ঠিকঠাক রাখত।

কুহুর সঙ্গে প্রদীপের ডিভোর্স হবে, সুদূর কল্পনাতেও এ আশঙ্কা ছিল না। অবশ্য এ দেশে বাঙালিদের মধ্যেও ডিভোর্সের সংখ্যা বাড়ছে। চেনাশুনোদের মধ্যেই তো তিনটি পরিবারে এ রকম ঘটেছে। স্বদেশ আর বর্নার তো বিয়ের তিন বছরের মধ্যেই। আবার ভবানী-আলোলিকার বিবাহের চল্লিশতম বার্ষিকী উপলক্ষে উৎসবও তো হল। দেশেও এখন বেশ ডিভোর্স হয়, অমিতার এক মামাতো বোন ব্যাঙ্গালোরে থাকে, সে ডিভোর্স করল গত বছর।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটা সমীক্ষায় অমিতা পড়েছেন যে এদেশে ডিভোর্সের ব্যাপারে শতকরা আটষট্টি জন পুরুষই দায়ী। ঘর সংসারের মায়া পুরুষদের কম। তবে, সেই সমীক্ষাতেই বলা হয়েছে, কিছু কিছু বিরাট ধনী ব্যক্তি ছাড়া অধিকাংশ পুরুষই সত্তর বছর বয়েস হয়ে গেলে আর বিবাহ-বিচ্ছেদের ঝুঁকি নিতে চায় না। যৌন ক্ষমতা কমতে শুরু করলে কমে যায় অ্যাডভেঞ্চার স্পৃহা। ধনী ব্যক্তিদের কি যৌন ক্ষমতা বেশি থাকে? তা নয়, তারা সমাজকে দেখাতে চায়, টাকা দিয়ে তারা ওদের হাঁটুর বয়েসি কোনও সুন্দরী যুবতীকে কিনতে পারে। এ ব্যাপারে আরবের শেখদের সঙ্গে আমেরিকান মাল্টি মিলিওনেয়ারদের বিশেষ তফাত নেই।

সত্যি কথা বলতে কী, নিজের মেয়ে হলেও কুহু সম্পর্কেই অমিতার ভরসা কম ছিল। কুহু যেমন ছটফটে স্বভাবের মেয়ে, অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে হঠাৎ কিছু একটা বাঁধিয়ে বসা তার পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না। সে রকম কিছু হলেও খুব সম্ভবত প্রদীপ তখুনি বিয়ে ভাঙতে চাইত না, সে কুহুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করত। ধীর স্থির স্বভাব প্রদীপের, খুবই ভদ্র, এই ধরনের ভদ্র মানুষেরা কোনও রকম স্ক্যান্ডাল পর্যন্ত করে না, বরং চাপাচুপি দিয়ে রাখতে চায়।

শেষ পর্যন্ত কি না প্রদীপই অন্য একজনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। নিজের মুখে সে স্বীকার করেছে, পারহ্যাপ্‌স আই অ্যাম হ্যাভিং অ্যান অ্যাফেয়ার...। এই পারহ্যাপ্‌স মানে কী? সত্যবাদী যুধিষ্ঠির সে। এটা কি যুধিষ্ঠিরের ইতি গজ?

ফোন বেজে উঠল। প্রদীপ।

যার কথা ভাবা যায়, অনেক সময় তারই ফোন আসে। প্রদীপ অবশ্য প্রায়ই ফোন করে। বিয়ের আগে থেকেই পরিচয়, তখন সে অমিতা আর অমলেশকে মাসিমা, মেসোমশাই বলত, এখন তাই-ই বলে।

রিসিভার তুলে অমিতা বললেন, হ্যাঁ প্রদীপ, বলো, কেমন আছ?

প্রদীপ বলল, উমম্, আই সাপোজ ভালই আছি। আপনাকে একটু বিরক্ত করছি মাসিমা, আপনার মেয়েকে একটু জিজ্ঞেস করবেন, আমার সিটি ব্যাংকের চেক বইটা কোথায় রাখা আছে? আমি সব কটা চেস্ট অফ ড্রয়ার্স খুঁজে দেখেছি।

অমিতা জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের চেক বই?

প্রদীপ বলল, না। আমাদের দু'জনেরই বরাবর সেপারেট অ্যাকাউন্ট।

তা হলে তোমার চেক বই ওর নিয়ে গিয়ে কোনও লাভ নেই।

না, না, না, আমি তা বলিনি। নিশ্চয়ই কোথাও রাখা আছে। আমি মনে করতে পারছি না। যদি ওর মনে থাকে।

তুমি কি আমার মেয়ের নাম ভুলে গেছ? আপনার মেয়ে বললে—

না, না, ছি ছি, নাম ভুলে যাব কেন? কুহু। মানে, আমি

আমার আর একটা প্রশ্ন আছে প্রদীপ। তোমাদের দু'জনের কি কথা

বন্ধ? এমনই ঝগড়া হয়েছে? সে জন্যই ভায়া মিডিয়ার দরকার?

ও নো, নট অ্যাট অল। আই সাপোজ উই আর সিভিলাইজ্‌ড পিপল। ঝগড়া তো কিছু হয়নি।

তা হলে এই সব কথা তুমি কেন কুহুকে সরাসরি জিজ্ঞেস করো না? তুমি ওর মোবাইল ফোন নাম্বার ভুলে গেছ? আমি আবার বলব, লিখে নেবে?

তার দরকার নেই, নাম্বার আমার মনে আছে। ওকে ফোন করি না, যদি ও ডিস্টার্বড বোধ করে? পারহ্যাপস উই শুড গিভ আস সাম মোর টাইম।

ওকে ফোন করলে তো ওর নাম ধরে ডাকতে হবে। অবশ্য ভাববাচ্যেও কথা বলা যায়। ভাববাচ্য কাকে বলে বোঝো? আর একটা কথা, প্রদীপ, তুমি কি আজকাল আই সাপোজ, পারহ্যাপস, এই সব শব্দ বেশি ব্যবহার করছ?

ও তাই নাকি? সরি, আই অ্যাম টেরিব্‌লি সরি। মাসিমা, আপনার গলার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারছি, আপনি আমার ওপর খুব বিরক্ত হয়ে আছেন, তা হলে আর...

শোনো, শোনো প্রদীপ। আমি মোটেই তোমার ওপর বিরক্ত হইনি। আমার বিরক্ত কিংবা রাগের অধিকার আছে আমার মেয়ের ওপর। তোমরা যে ডিসিশান নিয়েছ, সেটা তোমাদের দু'জনের নিজস্ব ব্যাপার। সেখানে আমাদের কথা তো খাটবে না! কিন্তু আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ভেঙে গেলেই যে তোমার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে যাবে, তা আমি বা অমলেশ, আমরা কেউই চাই না। তুমি সবসময় আমাদের বাড়িতে ওয়েলকাম। তোমার আর কুহুর জীবন আলাদা হয়ে গেছে, তবু যদি একটু ভদ্রতার সম্পর্ক থাকে, তাতেই আমরা খুশি হব।

থ্যাঙ্ক ইউ মাসিমা।

আমি কুহুকে এই চেক বইটার কথা জিজ্ঞেস করব। এর পর তুমি আমাকে ফোন করে তোমার নিজের খবরাখবর দেবে। আর ওই সব জিনিসপত্রের কথা কুহুকেই জিজ্ঞেস করবে, সেটাই প্রপার।

আচ্ছা তাই, যখন দরকার হবে

তুমি দই-বেগুন খেতে ভালবাসো। আর খিচুড়ি। এসো একদিন খেতে। উইক এন্ডগুলোতে তো থাকো না, সান ফ্রান্সিসকোতে যাও, কবে আসতে পারবে জানিও—

ফোনটা রাখার পর অমিতার মনে পড়ল, অমলেশ, ব্যাঙ্কের কী সব কাগজপত্র খুঁজছিলেন কাল রাত্রে। ক্রেডিট কার্ডের হিসেবের গরমিল হয়েছে, তাই নানান ড্রয়ার টানাটানি করতে করতে দূর ছাই, দূর ছাই বলছিলেন।

অমিতা কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করতেই পেয়ে গেলেন ব্যাঙ্কের সব স্টেটমেন্ট, আর তলার ড্রয়ারে পেলেন একটা ফাইল। তাতে পুরনো আমলের প্রায় হলদে হয়ে যাওয়া ছাপা কাগজপত্র, বাংলা পত্র-পত্রিকা থেকে কাটা।

সব কটাই মৃগনয়না দেবীর রচনা। প্রবাসী, বসুমতী আর দেশ পত্রিকায় ছাপা। অন্য সব কাজ ভুলে অমিতা ফাইলটা খুলে পড়তে বসে গেলেন। প্রায় রচনাই নারীর মুক্তি বিষয়ে। প্রচুর রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কোটেশান, আর আশালতা সিংহ নামে এক লেখিকার খুব প্রশংসা। অমিতা এই লেখিকার নাম শোনেননি।

মা যে একজন লেখিকা, তা অন্য ছেলেমেয়েরা কেউ মনে রাখেনি। মায়ের মৃত্যুর পর এই ফাইলটা অবহেলায় পড়েছিল পুরনো বইপত্রের মধ্যে। পরে একবার দেশে গিয়ে অমিতা মায়ের এই স্মৃতিচিহ্নটা নিজের কাছে নিয়ে আসেন। তখন ভাল করে খুলে দেখা হয়নি।

এখন অমিতা দেখছেন, প্রবন্ধগুলি পাতার নম্বর দিয়ে পরপর সাজানো, সামনে এক পাতার ভূমিকা, এটা মায়ের বই হিসেবে ছাপিয়ে বার করার ইচ্ছে ছিল। আহা রে, কেউ মাকে সাহায্য করেনি, বাবাও মায়ের এই সব লেখালিখিকে মনে করতেন ছেলেমানুষি। প্রকাশক পাওয়া কি সোজা কথা! বিশেষত একজন মহিলার, সে আমলে!

মা বেঁচে থাকলে আগামী এপ্রিলে তাঁর নব্বই বছর হত। এবার দেশে গেলে অমিতা বইটা ছাপিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করবেন। কত আর টাকা লাগবে! বড় জোর হাজার খানেক ডলার।

এক একটা জায়গা পড়তে পড়তে চমকে উঠছেন অমিতা। সাঙ্ঘাতিক সব দুঃসাহসিক অভিমত।

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার ... নামের প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দেবার পর মৃগনয়নী দেবী এক জায়গায় লিখছেন, নারীর অধিকার বলতে পশ্চিমী দেশগুলিতে নারীর সমান ভোটাধিকার আর কর্মসংস্থানের অধিকারই বুঝিয়েছে। আমাদের দেশ স্বাধীন হবার পর কাগজে-কলমে এই অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজে তা কতটা হয়েছে, তা সবাই জানেন। ... হরিণীর যেমন নিজের গায়ের মাংসটাই তার শত্রু, নারীরও স্বাধীনতার প্রধান বাধা তার শরীর। এই শরীরের জন্যই নারী বহু যুগ ধরে পরাধীন। পর্বত শিখরে কিংবা নির্জন সমুদ্র সৈকতের বাতিঘরে পুরুষ একাকী জীবিকা নির্বাহের জন্য থেকে যেতে পারে। কিন্তু কৈশোর উত্তীর্ণ হতে না হতেই নারী বাড়ির বাইরে নিরাপদ নয়। তার শরীর ভক্ষণ করার জন্য হিংস্র জানোয়াররা উদ্যত...

... শিশুদের যেমন নানাবিধ খেলনা দিয়ে ভোলানো হয়, বিবাহিতা রমণীদেরও প্রায় প্রতি বৎসর একটি করে সন্তান দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হয়। তাদের পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়, নাও, তোমরা এই সন্তান পালন নিয়ে মেতে থাকো, নিজেদের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ বিসর্জন দাও!...

... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মা রত্নগর্ভা ছিলেন, চোদ্দোটি সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছেন, তাদের মধ্যে যে-ক'জন বেঁচে ছিলেন প্রত্যেকটি কত রকম গুণে গুণী। পিতা দেবেন্দ্রনাথ প্রখ্যাত ধর্মপ্রবক্তা ও রতি-প্রবণ, আর কোন ধর্মগুরু এ দেশে এতগুলি ছেলেমেয়ের পিতৃত্ব অর্জন করেছেন! সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের মায়ের কথা ক'জন জানে? কতটুকু লেখা হয়েছে তাঁর সম্পর্কে? জওহর লাল নেহরুর পিতা স্বনামধন্য মতিলাল নেহরু, কিন্তু তাঁর মায়ের নাম কী? শুধু পুরুষের বীর্যেই সন্তানের জন্ম হয়, এই রকম একটি অবৈজ্ঞানিক মিথ্যা তথ্য বহুকাল ধরে প্রচারিত হয়ে আসছে। অথচ এই শতাব্দীর শুরুতেই প্রমাণিত হয়ে গেছে যে সন্তান উৎপাদনে নারী ও পুরুষের ভূমিকা সমান সমান।...

...কোনও কোনও নারী বাঁজা হতে পারে, সে রকম কত নারী অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করেছে কিন্তু অনেক পুরুষও যে বাঁজা হয়, সে কথা কোনও কাব্য-সাহিত্যে প্রচারিত হয়েছে কী? মহাভারতের পাণ্ডবদের পিতা পাণ্ডু রাজা নিশ্চিত বাঁজা ছিলেন। তপাপি কুন্তীর বারংবার গর্ভবতী হওয়ার অলৌকিক কাহিনি দিয়ে সে তথ্য আড়াল করা হয়েছে অবশ্যই...

...নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা, তার শরীরের স্বাধীনতা। বিবাহিতা নারী সন্তান ধারণের জন্য তার স্বামীর খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভর করবে না। স্ত্রীরও ইচ্ছা-অনিচ্ছার গুরুত্ব দিতে হবে। স্বামীটি যদি অসৎ ব্যক্তি হয়, ক্রুর কিংবা রুক্ষভাষী হয়, তবে স্ত্রীর তার সঙ্গে সহবাসে অসম্মতি জানাবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার থাকবে। সে ক্ষেত্রে অপর কোনও পুরুষের সঙ্গে প্রণয় হলে সে কখনও তার শয্যাসঙ্গিনী হতেই পারে। অনেক গরিব ঘরে কন্যার বিবাহের সময় পণ ও যৌতুকাদির জন্য পিতা মাতাকে সর্বস্বান্ত হতে হয়। এই সব কন্যাদের দৃঢ় ভাবে বিবাহে অসম্মতি জানানো উচিত। অনেক পুরুষ সারা জীবন বিয়ে করে না, মেয়েরা কেন তা পারবে না? বিয়ে না করলেও সে মেয়েকে ব্রহ্মচারিণী হয়ে থাকতে হবে কেন? স্বাভাবিক যৌন জীবনের অধিকার স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই সমান।...

পড়তে পড়তে অমিতা ভাবলেন, মা কি জারমেইন গ্রিয়ারের 'দা ফিমেল ইউনাখ' পড়েছেন? খুব সম্ভবত মায়ের এই লেখা সেই বইয়েরও আগে। সময়টা মিলিয়ে দেখতে হবে। একজন বাঙালি মহিলা কত

দিন আগে এই সব কথা ভেবেছিলেন, এ দেশের নারীবাদীরা তা জানেও না।

অমিতা মায়ের এই চিন্তাধারার উত্তরাধিকারিণী তো হননি। তিনি লেখাপড়া শিখেছেন, এ দেশে এসে কিছু কিছু ব্যাপারে সংস্কারমুক্ত হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর জীবনটা তো কাটছে আর পাঁচজন নারীর মতনই। তিনি নিজে রান্না করেন, তবু রান্নাবান্নার দায়িত্ব, স্বামীকে প্রতিদিন ঠিক সময়ে ওষুধ খাওয়ানো অতিথি এলে, মেয়ে আর নাতি-নাতনিরা এলে তাদের যত্ন-টত্ন করার সব ভার তাঁরই। কোনও ব্যাপারেই বিদ্রোহ করেননি, নিজের বিশেষ অধিকার চাননি। এক বার অমলেশকে অফিসের কাজে গিয়ে থাকতে হয়েছিল আর্জেন্টিনায়, দু'বছরের জন্য। তখন অমিতাকে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে যেতে হয়েছিল স্বামীর সঙ্গে। এর উল্টো ব্যাপার হলে কি অমলেশ চাকরি ছাড়তেন? সেই দু'বছর দেশেও যাওয়া হয়নি, অমিতা একা ঘুরে আসতে চেয়েছিলেন কিছু দিনের জন্য, অমলেশ রাজি হননি স্ত্রীকে একা পাঠাতে।

এক প্রজন্ম পেরিয়ে পরের প্রজন্মে প্রতিফলিত হচ্ছে তাঁর মায়ের চিন্তাধারা। কুহু তার দিদিমার মতন নারী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। অস্পষ্ট

একটা কথা, পারহ্যাপস শুনেই সে স্বামীকে ছেড়ে চলে এল। একা একা থাকছে নিউ ইয়র্কে। কুহুর এখন পূর্ণ যৌবন, সে বেশি দিন একা থাকতে পারবে? এখানকার নারীবাদীদের যে-সব যৌন লাম্পট্যের কাহিনি শোনা যায়, কুহুও কি প্রদীপের ওপর রাগ করে সেই রকম জীবন শুরু করবে? ভাবতেও ভয় করে। অথচ কুহুকে কিছু বলাও যাবে না।

মায়ের এই লেখাগুলো কুহুকে পড়তে দিতে হবে।

লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। অমিতা নেমে এলেন নীচে।

রান্না করার দরকার নেই। গতকাল অমলেশের সহকর্মী অ্যামেন আর তার স্ত্রী জুডিথ এসেছিল ডিনার খেতে, একটা মেক্সিকান রেস্তোরাঁ থেকে আনানো হয়েছিল খাবার। প্রচুর লেফট ওভার আছে। শুধু খানিকটা ভাত করে নিতে হবে।

যথারীতি টি ভি'র সামনে বসে আছে অনীশ। খবর দেখছে।

কিছু দিন আগে মিনেসোটায় একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। মিসিসিপি নদীর ওপর অকস্মাৎ ভেঙে পড়েছে একটা ব্রিজ। নদীর ওপর ছ'লেনের একটা চওড়া রাস্তা, অনবরত গাড়ি চলে, ব্রিজ ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে অনেকগুলো গাড়ি পড়ে গেছে জলে। এ পর্যন্ত পাঁচটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আঠেরো জনের এখনও সন্ধান নেই। বাইশটি ছেলেমেয়ে ভর্তি একটি স্কুল বাসও নেমে গিয়েছিল নদীগর্ভে, পাশের গাড়ি থেকে বেরিয়ে এক অসীম সাহসী যুবা বাসটার দরজা খুলে দিয়ে সবক'টি ছেলেমেয়েকেই বাঁচাতে পেরেছে। ভাগ্যিস এ দেশের প্রায় সব বাচ্চাই সাঁতার শিখে নেয়।

ঘটনাটি আলোচিত হচ্ছে সারা দেশে। অমন ব্যস্ত একটা সেতু, তার মেনটেনান্সের কোনও ব্যবস্থা ছিল না? একটু-আধটু ক্র্যাক হল না, একেবারে ভেঙেই পড়ে গেল! এ রকম তো ভারত বাংলাদেশে হয়। এখন জানা যাচ্ছে, ব্রিজটার ডিজাইনেই কিছু ভুল ছিল, যা স্টিল ব্যবহার করা হয়েছে, তাও উপযুক্ত নয়। আমেরিকাতেও এই কাণ্ড? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সারা দেশে অন্তত আড়াই হাজার ব্রিজের নকশায় এ রকম ত্রুটি আছে। অর্থাৎ সেগুলোও যখন তখন ভেঙে পড়তে পারে।

'বিলেত দেশটাও মাটির, নয়কো সোনা রুপোর', এই মর্মে ডি এল রায়ের একটা গান আছে। এখানকার ভার্জিনিয়ার এক কবি অনুপম দস্তিদারও একটা গান রচনা করেছে, মার্কিন দেশেও আছে মশা মাছি ভাই রে,/ আছে সস্তা, আছে দামি, মাঝারি কিছুই নাইরে/ যত গাড়ি, তত বন্দুক, বেগেল-পিৎসা খাই রে...।

অনীশের খাবার দিয়ে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে খবর শুনলেন অমিতা। তার পর অভ্যেসবশত বললেন, তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নাও। ঠান্ডা কোরো না।

অনীশ হঠাৎ মুখ তুলে বলল, বউদি, হোয়াট অ্যাম আই ডুয়িং হিয়ার? আজ কত তারিখ?

একেবারে স্বাভাবিক মানুষের মতন কণ্ঠস্বর। কয়েক দিন পর পর এ রকম দু'একটা কথা বলে ওঠে সে। প্রতিবারেই অমিতা চমকে ওঠেন।

তিনি বিস্ময় গোপন করে বললেন, আজ ১৪ই নভেম্বর।

অনীশ ভুরু কুঁচকে বলল, ফোরটিন্থ? আমি এখানে এখনও বসে আছি? সিক্সটিন্থ আমার জয়েনিং ডেট!

অনীশের আগের চাকরি চলে গেছে, নতুন কোথাও যোগ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না এ অবস্থায়।

অমিতা জিজ্ঞেস করলেন, কিসের জয়েনিং ডেট?

অনীশ বলল, বাঃ, দুর্গাপুরে যেতে হবে না?

অমিতা জিজ্ঞেস করলেন, দুর্গাপুর? কোন দুর্গাপুর?

অনীশ বলল, দুর্গাপুর মানে দুর্গাপুর। স্টিল ফ্যাক্টরিতে আমি চাকরি পেয়েছি।

এ বারে অমিতা আর বিস্ময় লুকোতে পারলেন না। বলে কি মানুষটা? এ দেশে আসবার আগে অনীশ দুর্গাপুরে চাকরি করেছিল কয়েক মাস। তিরিশ-বত্রিশ বছর আগেকার কথা। সেখানে ফিরে গেছে অনীশ!

এই অবস্থায় কী বলা উচিত তা ভেবে পেলেন না অমিতা।

অনীশ খাবারের প্লেটটা সাইড টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, ট্রেনের টিকিট কাটা আছে। হাওড়া স্টেশনে অরিন্দম আমাকে মিট করবে। অরিন্দমও আমার সঙ্গে যাবে।

অনীশ উঠে দাঁড়াতেই অমিতা বললেন, বসো, বসো, খাবারটা আগে খেয়ে নাও।

অনীশ বলল, দেরি হয়ে গেছে। খাওয়ার আর সময় নেই। বললাম না, অরিন্দম দাঁড়িয়ে থাকবে।

অমিতা বললেন, না, অনীশ, তুমি ভুল করছ। অরিন্দম অপেক্ষা করছে না। তুমি বসো, আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি।

অনীশ যা কখনও করে না, এ বার গলা চরিয়ে ক্রুদ্ধ ভাবে বলল, হোয়াট ডু ইউ মিন? অ্যাম আই টেলিং ইউ আ লাই? অরিন্দম ইজ ওয়েটিং ফর মি অ্যাট দা হাওড়া স্টেশান।

অমিতা বললেন, অনীশ, তুমি এখন হাওড়া স্টেশানে যাবে কী করে? সে যে অনেক দূর। এটা আমেরিকা!

অনীশ বলল, ড্যাম ইয়োর আমেরিকা! আই অ্যাম গোয়িং টু দুর্গাপুর!

সে এগিয়ে গেল সদর দরজার দিকে।

অমিতা দৌড়ে গিয়ে তার হাত চেপে ধরে ব্যাকুল ভাবে বলতে লাগলেন, অনীশ, অনীশ, প্লিজ, প্লিজ, মাথা ঠান্ডা করো, দুর্গাপুরে তুমি চাকরি করতে বহু বছর আগে।

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল অনীশ। আজ আবার বরফ পড়ছে।

অমিতা খালি পায়ে বেরিয়ে এসেও অনীশকে আর ধরতে পারলেন না। হন হন করে এগিয়ে যাচ্ছে অনীশ। এই ঠান্ডার মধ্যে শুধু প্যান্ট-শার্ট পরা। অমিতা গলা ফাটিয়ে ডাকতে লাগলেন তার নাম ধরে। সে গ্রাহ্য করল না।

কয়েক মুহূর্ত বিভ্রান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন অমিতা। তাঁর কান্না পাচ্ছে। তার পরেই ছুটে গেলেন ফোনের কাছে। ডাই নাইন ইলেভেন।

সঙ্গে সঙ্গে একটি কণ্ঠস্বর বলল, ফোরটিন্থ নভেম্বর, টাইম ইজ ওয়ান ফিফটি পি এম। হোয়াট ইজ দা প্রবলেম।?

অমিতা হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগলেন, আমাদের একজন আত্মীয়, মেন্টালি আনস্টেবল, রাস্তায় বেরিয়ে গেল, ওর কাছে টাকা পয়সা নেই—

পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যে এসে পড়বে পুলিশের গাড়ি। এসেই ওরা অনীশের একটা ছবি চাইবে। একটা ছবি খুঁজে বার করতে হবে এক্ষুনি।

॥ ৮ ॥

তরঙ্গে ভাসছে একটা ভেলা

লিন্ডার তিনটি ছেলেমেয়ের মধ্যে প্রথমটি বেশ বড় হয়ে গেছে, বছর পনেরো হবে, অন্য মেয়ে দুটির বয়েস সাত আর তিন। তিন ঘরের অ্যাপার্টমেন্টে এই ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে লিন্ডার মা-ও থাকেন, তিনি এখন অন্ধ, তবে শরীর বেশ শক্ত-সমর্থই আছে। কুচকুচে কালো রঙের এই মহিলা জর্জিয়ার একটি ফার্মে কাজ করতেন, সেখানে একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ তাঁকে ধর্ষণ করত নিয়মিত। সেই ভাবেই লিন্ডার জন্ম। লিন্ডার মুখে তার এই জন্ম কাহিনি আগেই শুনেছে কুহু। এই জন্যই লিন্ডার গায়ের রং সাদা কালোর মাঝামাঝি।

জর্জিয়া, অ্যালাবামা এই সব রাজ্যে এক সময় বর্ণবৈষম্য খুব প্রবল ছিল। এখনও যে নেই, তা বলা যায় না। দক্ষিণের ওই সব জমি তুলো চাষের উপযোগী খুব উর্বর। শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা প্রচুর কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস নিয়োগ করত সেই সব জমিতে। যতই কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ থাক, তবু কৃষ্ণাঙ্গিনী রমণীদের ইচ্ছে মতন বলাৎকার করতে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের কোনও দ্বিধা ছিল না।

পড়াশুনোয় মেধাবিনী ছিল লিন্ডা, তাই সে ওসব অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। ব্রুকলিনের হাসপাতালে সে সুপারের কাজ করে, বেশ ভাল উপার্জন। বিয়ে করবে না, আগেই ঠিক করে ফেলেছে, প্রেমিক নির্বাচনে সে সাদা-কালোর প্রভেদ করে না, যখন যার সঙ্গে মজে মন। কন্ডোম ব্যবহার করে না লিন্ডা, সে সন্তান চায়। কোনও পুরুষের সঙ্গে সহবাসের ফলে গর্ভবতী হলেই সে তৎকালীন প্রেমিকটিকে তাড়িয়ে দেয়।

একবার কী হয়েছিল জান, হাসতে হাসতে বলল লিন্ডা, একটি ইহুদি ছেলে এমন প্রেমে পড়ে গেল, সে আর যেতেই চায় না। সে আমাকে বিয়ে করবেই করবে। এই অ্যাপার্টমেন্টে প্রত্যেক দিন আসে, আমার মাকে মা বলে কত আদিখ্যেতা করে। শেষ পর্যন্ত পুলিশের ভয় দেখিয়ে তাকে তাড়াতে হল।

কুহু জিজ্ঞেস করল, তোমার একটুও প্রেম হয়নি তার সঙ্গে?

লিন্ডা বলল, হ্যাঁ, প্রথম কয়েক মাস, কিন্তু সে প্রেমকে টেনে লম্বা করলে তা আর প্রেম থাকত না, শুরু হত মারামারি। আমার এমনই স্বভাব হয়েছে। জান কিউহু, বাড়িতে সর্বক্ষণ একজন পুরুষ মানুষ থাকা আমি সহ্যই করতে পারি না। মাঝে মাঝে ঘনিষ্ঠ হওয়াই যথেষ্ট।

কুহু আবার জিজ্ঞেস করল, তোমার ছেলে-মেয়েরা, বিশেষ করে তোমার বড় ছেলেটি, বাবার কথা জিজ্ঞেস করে না?

লিন্ডা বলল, এ দেশের ছেলে-মেয়েরা স্কুলে পড়তে পড়তেই সারোগেট মাদারের ব্যাপারটা জেনে যায়। আশেপাশে এ রকম কিছু দেখেও তো। সুতরাং আমি যখন বলি, বাবা নেই, শুধু মাকে নিয়ে খুশি থাকতে পার না? তখন ওরা আর কিছু বলে না। তা ছাড়া, আমাদের কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে বিয়ের আগেই বাচ্চা জন্মে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। সে সব বাচ্চার অনেকেরই পিতৃপরিচয় থাকে না। এটা অনেক কালের পুরনো ধারা। এ ধারা আমরা আফ্রিকা থেকে নিয়ে এসেছি। জানো, এখনও আফ্রিকার কোনও কোনও ট্রাইবের মধ্যে মেয়েদের যদি বিয়ের আগে সন্তান না হয়, তা হলে সে সব মেয়ের বিয়ে হওয়াই মুশকিল।

কুহু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, সে কি! কেন?

লিন্ডা বলল, পুরুষরা আগে থেকে যাচাই করে নিতে চায়, যাকে বিয়ে করবে, তার সন্তান ধারণের ক্ষমতা আছে কি না! না হলে শুধু শুধু বিয়ে করবে কেন?

কুহু বলল, সন্তানের জন্য বিয়ে! আমাদের দেশেও আগেকার দিনে বলা হত, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা! বিয়ের আগের সন্তান, তাকেও স্বামীরা নিয়ে নেয়?

লিন্ডা বলল, কখনও নেয়। অধিকাংশ সময়েই সেই বাচ্চাটা মানুষ হয় দিদিমা-দাদুর কাছে। তারাও বুড়ো বয়েসের একজন অবলম্বন পেয়ে যায়।

কুহু বলল, বেশ তো ভাল ব্যবস্থা। আমাদের দেশে, এমনকী এই সব দেশেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত মেয়েদের সতীত্ব নিয়ে কড়াকড়ি, সেটাই কি সভ্যতার চিহ্ন, না আফ্রিকার ওইসব ট্রাইবই আসলে সভ্য!

লিন্ডা বলল, সে তুমি যে ভাবে চাও ব্যাখ্যা কর। আমি মনে করি, আসলে বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি, সেটাই শুধু সভ্যতার অগ্রগতি। বিকাশের নতুন নতুন আবিষ্কার, আমাদের জীবনে কত স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে, আকাশটাকে সত্যিকারের মহাকাশ করেছে। এ ছাড়া আদিকাল থেকে মানুষ বিশেষ কিছু বদলায়নি। মানুষ অতি স্বার্থপর, হিংস্র প্রাণী।

কুহু বলল, তুমি কী বলছ লিন্ডা। শুধু বিজ্ঞানের অগ্রগতি? কাব্য, দর্শন, ছবি, তুমি ভাবো তো, কেইভ পেইন্টিং থেকে রেনেশাঁস আমলের চিত্রকলা, কত রকমের গান, সাহিত্য...

তাকে থামিয়ে দিয়ে লিন্ডা বলল, মাই ডিয়ার কিউহু, তোমার ওই কাব্য-দর্শন-ছবিটবি মাত্র কত পার্সেন্ট মানুষ উপভোগ করে? পৃথিবীর জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র অংশ। বেশির ভাগ মানুষই মাথা মোটা। এই দ্যাখো না, স্পাইডার ম্যান নামে আজগুবি ফিল্ম হলে কোটি কোটি মানুষ তা দেখতে যায়, আর ইনগমার বার্গমানের ছবি ক'টা লোক দেখে? এই তো কয়েক মাস আগে উনি মারা গেলেন, নিউ ইয়র্ক টাইমসে এক বিজ্ঞ সমালোচক লিখলেন, বার্গম্যানের ওই সব ধোঁয়াটে ফিল্মগুলো নিয়ে ইনটেলেকচুয়ালরা বাড়াবাড়ি করেছে, ওগুলো আসলে তেমন কিছু না। এই জেনারেশানের ছেলে-মেয়েরা বার্গম্যান দেখে না।

কুহু জোর দিয়ে বলল, বাজে কথা! এখনও কলেজের ছেলে-মেয়েরা ফিল্ম ক্লাবে...

লিন্ডা বলল, ফিল্ম ক্লাবে? হ্যাঁ, দেখে নিশ্চয়ই, সারা পৃথিবীর জনসংখ্যার পয়েন্ট জিরো ওয়ান পারসেন্ট, তার বেশি কি?

এই সব আলোচনা হঠাৎ এক সময় থেমে যায়। লিন্ডা একটা গান গেয়ে ওঠে : ভার্জিন মেরি হ্যাড ওয়ান সান, ও হেলিলুইয়া...'। লিন্ডার মা-ও গলা মেলান তাতে।

গানটা শেষ হবার পর লিন্ডা ঝুঁকে এসে ফিসফিস করে বলল, আমার মা ডিভাউট ক্রিশ্চান। মাকে রাগাবার জন্য আমি মাঝে মাঝে বলি, ইমাকুলেট কনসেপশান বলে কিছু হতেই পারে না। জোসেফ আর মেরির আরও ছেলেমেয়ে ছিল। তা হলে কি, ডিড গড ফা... জোসেফস ওয়াইফ? তখন মা আমাকে মারতে আসেন!

হাসতে হাসতে সে গড়িয়ে পড়ে।

লিন্ডার ফ্ল্যাটে ডিনার খেতে এসে চমৎকার সময় কাটল কুহুর।

একটি বেশ সহজ, স্বাভাবিক পরিবার, মা ও ছেলে-মেয়ে নিয়ে লিন্ডার সংসার অন্য অনেকেরই মতন, শুধু পুরুষ-বর্জিত। এবং লিন্ডা বিবাহ-বিচ্ছিন্না কিংবা বিধবা নয়।

ফেরার পথে ট্রেনে কুহু একটা বই পড়তে শুরু করল। লিন্ডাই তাকে দিয়েছে, নাওমি ক্যাম্বেল-এর 'ফায়ার উইথ ফায়ার'। এটাও মেয়েদের ক্ষমতা দখল এবং যৌন স্বাধীনতা-বিষয়ক প্রবন্ধ সঙ্কলন।

রাত হয়ে গেছে, সাড়ে দশটা বাজে। একবার একটু ঢুলুনি এসে যাওয়ায় হাত থেকে পড়ে গেল বইটা।

উল্টো দিকের সিটে বসা একজন যুবক বইটা তুলে দিল। কুহুরই সমবয়েসি হবে, মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে, শ্বেতাঙ্গ। মাঝারি স্বাস্থ্য, কালো সোয়েটার ও টুইডের জ্যাকেট পরা, চোখে রিমলেস চশমা।

কুহু তাকে ধন্যবাদ জানাতেই যুবকটি বলল, যদি কিছু মনে না কর, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? তুমি কি এই লেখিকার লেখা বিশেষ পছন্দ কর? তুমি কি ওঁর আগের বইটা পড়েছ?

কুহু বলল, ওঁর আগের বইটা, 'দা বিউটি মিথ' আমাকে একজন উপহার দিয়েছে। দুঃখের বিষয় আমার সে বই পুরো পড়া হয়নি।

যুবকটি বলল, দুটো বইতে কি প্রায় একই কথা বলা হয়নি?

কুহু বলল, আমি এ বইটা সবে মাত্র পড়তে শুরু করেছি। হয়তো প্রথম বইটা আমার আগে পড়ে নেওয়া উচিত ছিল। সুতরাং আমি ঠিক তুলনা করতে পারব না।

যুবকটি বলল, তোমার কি মনে হয় না, এই যে ফেমিনিস্ট লেখকরা সব সময় আস ভার্সাস দেম, মানে, পুরুষদের ওরা ওরা বলে, যেন পুরুষরা একটা আলাদা জাত, সেটা ঠিক? যেন একটা যুদ্ধ চলছে।

কুহু মৃদু হেসে বলল, না, আমি যত দূর জানি, সে রকম কোনও যুদ্ধ এখনও শুরু হয়নি।

সব পুরুষকেই শত্রুপক্ষ ভেবে নেওয়া বোধহয় ঠিক নয়। তুমিও কি তাই মনে কর?

পুরুষদের মধ্যে আমার বেশ কয়েকজন বন্ধু আছে। আবার পছন্দ করি না, এমনও আছে। মেয়েদের মধ্যেও তাই।

শুনে আশ্বস্ত হলাম। বাই এনি চান্স, তুমি কি ইজিপশিয়ান?

না। বাই এনি চানস, তুমি কি হাঙ্গেরিয়ান?

না। হাঙ্গেরিয়ানরা খুব বুদ্ধিমান জাতি, আমি তাদের একজন হলে খুশি হতাম। আমি আমেরিকান বাই বার্থ। তবে ফ্রেঞ্চ অরিজিন। তুমি কি তবে পাকিস্তানি?

এবার অনেকটা ঠিক বলেছ। আমি যে দেশ থেকে এসেছি, পাকিস্তান এক সময় সেই দেশের মধ্যেই ছিল। আমরা প্রায় একই রকম।

ইন্ডিয়া? দে আর ভেরি ব্রাইট অ্যান্ড জেন্টল পিপল। ভারতীয় মেয়েরা বেশ সুন্দর ভাবে হাসতে পারে।

কামরায় বেশি লোক নেই। নিত্যযাত্রীরা প্রায় সবাই সঙ্গে বই রাখে, কেউ কেউ এই সময় ঝিমোয়।

এই লোকটি সময় কাটাবার জন্য তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, অতি সাধারণ কথাবার্তা। লোকটির আচরণ ভদ্র, কিন্তু চোখের দৃষ্টি ভাল নয়। সে বার বার চোখ বোলাচ্ছে কুহুর সারা শরীরে। আর হাঁটু দুটো দোলাচ্ছে বেশ জোরে জোরে।

মেয়েদের সামনে ও রকম ভাবে হাঁটু দোলানো মোটেই শোভন নয়। এটা কি একটা অসুখ। কিংবা কোনও কারণে লোকটি খুব উত্তেজিত হয়ে আছে?

লোকটি বলল, আমার নাম ফ্রাঁসোয়া রিজ, তুমি আমাকে ফ্রান্সিস বলে ডাকতে পারো।

কুহু নিজের নাম জানাল।

লোকটি ঠোঁট সরু করে তিনবার বলল, কিউ হিউ। তার পর বলল, হোয়াট আ সুইট নেম।

খানিক বাদে এসে গেল কুহুর স্টেশন। উঠে দাঁড়িয়ে কুহু বলল, তোমার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল। গুড বাই।

লোকটি বলল, তোমার সঙ্গে আলাপ করে আমারও খুব ভাল লেগেছে। অবশ্য, আমি তোমাকে বই পড়তে দিইনি।

প্রথমে লোকটি বসেই ছিল, যেন সে অন্য স্টেশনে যাবে। তার পর সে হঠাৎ তড়াক করে উঠে দ্রুত এগিয়ে এল দরজার দিকে। নামল কুহুর সঙ্গে।

কুহু মনে মনে ভাবল, লোকটির বদ মতলব আছে কিনা তা বোঝা

যাবে একটু পরেই।

তবে কুহু ভয় পাচ্ছে না। যারা এত হাঁটু নাড়ায় তারা নিজেরাই সাধারণত ভিতু হয়।

কুহুর পাশে হাঁটতে হাঁটতে লোকটি বলল, তুমি কত দূর থাকো। আমার সে রকম কোনও কাজ নেই, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি। অথবা, তোমার যদি তেমন তাড়া না থাকে তা হলে কোথাও বসে খানিকটা সময় কাটাতে পারি। ইন্ডিয়া সম্পর্কে কত কী জানার আছে।

কুহু বলল, আমার গাড়ি এখানে পার্ক করা আছে। আমাকে গাড়িটা নিতে হবে আর বাড়ি ফেরারও তাড়া আছে।

লোকটি অত্যুৎসাহে বলল, তোমার গাড়ি এখানে? তাহলে আমায় কি একটু লিফট দেবে?

তার চোখে কি কিছু একটা ঝিলিক দিল?

কুহু থমকে দাঁড়িয়ে বলল, মিস্টার রিজ, কিছু মনে করবেন না, কোনও স্ট্রেঞ্জারের সঙ্গে অন্তত তিন বার দেখা না হলে তাকে আমি গাড়িতে তুলি না। আমি দুঃখিত।

সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল লোকটি। কুহু গাড়ির দরজা খুলে স্টিয়ারিং-এ বসল।

হাসির ঢেউ খেলে গেল তার ঠোঁটে। লোকটির কু মতলব ছিল কিনা বোঝা গেল না। তবে কিছু একটা ইঙ্গিত দিয়েছিল ঠিকই। বোধহয় শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলোয়নি।

ব্যাপারটিতে মজাই লেগেছে কুহুর। একজন কোনও পুরুষ তার প্রতি উৎসাহ দেখাচ্ছে, এতে একটু খুশিই হয় মেয়েরা। আবার সেই সব পুরুষকে প্রত্যাখ্যান করারও একটা আনন্দ আছে। ইউসুফের সঙ্গে এর মধ্যে দেখা হয়েছে দু'বার, বাড়িতে নয়, নিউ ইয়র্ক শহরে। সে এখন এখানকারই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছে।

সে রাতে প্রায় ভোর পাঁচটা পর্যন্ত জেগে ছিল দু'জনে। শরীরের মিলন এবং পুনর্মিলন হয়েছে দু'বার। কুহু সত্যিকারের তৃপ্তি পেয়েছে। কিন্তু ইউসুফের সঙ্গে এই সম্পর্ক সে প্রাত্যহিক বা নিয়মিত করে নিতে চায়নি। সে তো একা থাকার জন্যই এসেছে এখানে। ইউসুফকে সে বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দিয়েছে, তবে বাইরে দেখা করতে তার আপত্তি নেই।

ইউসুফের সঙ্গে এক রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে তার সেই বন্ধু দু'জনের সঙ্গেও দেখা হয়ে গিয়েছিল। তাদের কথাবার্তার মধ্যে কুহু যেন একটু আঁচ পেয়েছিল যে সুরাইয়া নামের মহিলার সঙ্গে ইউসুফের কিছু একটা সম্পর্ক আছে। সুরাইয়ার প্রসঙ্গ উঠতেই ইউসুফ চাপা দিতে চেয়েছিল তাড়াতাড়ি। তাহলে কি ইউসুফ কিছুটা ছলনা করেছে তার সঙ্গে? ওসব মুক্তি টুক্তি নিছক কাব্য কথা!

তা হোক, তাতেও ক্ষোভ হয়নি কুহুর। সে তো ইউসুফের জীবন সঙ্গিনী হতে চায় না! অনেক দিনের পরিচয়, এক সময় ইউসুফকে গ্রহণ করতেও রাজি ছিল সে, কোনও কারণে তা হয়নি এত দিন। এখন কুহুরই বোধহয় মুক্তির প্রয়োজন ছিল।

বাড়িতে এসে ফোনের মেসেজ শুনল কুহু। তার মধ্যে একটা প্রদীপের। এই প্রথম। খুবই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, কুহু একটু দরকার ছিল তোমার সঙ্গে।

কুহু মেসেজটা মুছে দিল, সে নিজে মোটেই ফোন ব্যাক করবে না।

অন্য মেসেজ বাবার, জয়ন্তীর আর ডক্টর ফারুখ আহমেদের। বাবা কেন ফোন করেছিলেন? মায়ের সঙ্গে তো রোজই কথা হয়, বাবা তখন বাড়িতে থাকলে তাঁকেও ডাকে কুহু, কিন্তু বাবা তো কখনও নিজে থেকে ফোন করেন না! অন্য দু'জনের মেসেজ সে আর শুনল না, শুধু নাম জেনে নিল।

এখন প্রায় এগারোটা বাজে। এতক্ষণে বাবার ঘুমিয়ে পড়ার কথা। কাল সকালেই ফোন করতে হবে। কাকামণির আবার কিছু হল?

বাড়ি থেকে হঠাৎ চলে গিয়েছিল অনীশ। পকেটে টাকাপয়সা বা ক্রেডিট কার্ড কিছুই ছিল না। পুলিশ তাকে খুঁজে এনে দেয় তিন ঘণ্টার মধ্যে। নাইনটি থ্রি সাউথ ধরে সে হাঁটছিল। কুহু এ সব খবরই জানে। কাকামণি আমেরিকার জীবনের কথা একেবারে ভুলে গিয়ে মনে মনে ফিরে গেছেন দুর্গাপুরে। এখন তাকে সবসময় চোখে চোখে রাখতে হয়, অমিতা আর অমলেশ দু'জনেই কখনও বেরলে বাইরের দরজায় তালা দিয়ে যান।

ডাক্তারের পরামর্শে অনীশকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ঠিক হয়েছে। দুর্গাপুরেও একবার ঘুরিয়ে আনলে যদি মাথার জানলা আবার খোলে। কিন্তু একলা পাঠানো সম্ভব নয়, বস্টন থেকে সোজা একটা প্লেন কলকাতায় যায় না, লন্ডন কিংবা ফ্র্যাঙ্কফুর্টে ফ্লাইট বদলাতেই হবে, অনীশ তা পারবে না। আগামী মাসে অমিতা আর অমলেশ দেশে যাবেন ঠিক করে ফেলেছেন, তাঁরাই সঙ্গে নিয়ে যাবেন অনীশকে।

কুহু এর মধ্যে একবার যাবে অনীশকে দেখে আসতে।

পরদিন সকালে কুহুর ঘুম ভাঙল প্রদীপের ফোনে। ইদানীং কুহু একটু বেশিক্ষণ ঘুমোনো অভ্যেস করে ফেলেছে, এখন বাজে পৌনে নটা। চড়া রোদ উঠেছে আজ, জানলা দিয়ে রোদ পড়েছে ঘরে।

প্রদীপ বলল, কুহু আমি দীপ।

তার গলাটা ভাঙা ভাঙা, সম্ভবত ঠান্ডা লেগেছে। শীতের শুরুর দিকে সবারই একটু ঠান্ডা লেগে যায়।

কুহু নিস্পৃহ গলায় বলল, হ্যাঁ, বলো—

প্রদীপ আবার বলল, কুহু, আমি দীপ

এক যুগের বেশি বিবাহিত জীবনের পরও স্বামীর গলা চিনতে পারবে না কুহু?

আর কিছু বলছে না প্রদীপ। একেবারে চুপ।

কুহুই বলল, হ্যাঁ, বলো। কিছু বলবে?

কুহু, তুমি ভাল আছ?

খুব ভাল আছি। তা জানার জন্য নিশ্চয়ই ফোন করোনি। আবার কোনও কিছু খুঁজে পাচ্ছ না! মা'র কাছে তো শুনি, তুমি প্রায়ই নানান জিনিস হারিয়ে ফেলছ। এখন কোনটা?

কী জানি! মনে হচ্ছে যেন আমি নিজেকেই হারিয়ে ফেলছি।

কুহু একটু অবাক হল। প্রদীপ তো এ ধরনের হেঁয়ালি করে কিংবা কাব্য করে কথা বলে না। তার কথাবার্তা সোজাসুজি।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর প্রদীপ আবার বলল, তুমি কি কথা বলতে রাজি আছ আমার সঙ্গে? নাকি ফোন রেখে দেবে?

কুহু বলল, কথা বলব না কেন? যদি তোমার কিছু জানবার থাকে—

প্রদীপ বলল, জানবার মানে... জানতে চাইছি, কয়েকটা সপ্তাহ, কিংবা কয়েকটা দিন কি খোকা আর খুকির সঙ্গে তুমি এই বাড়িতে এসে থাকতে পারবে?

কুহু বলল, তা কী করে হবে। ওদের এখন স্কুল খোলা।

প্রদীপ বলল, শিগগিরই ওদের ক্রিসমাসের ছুটি হবে। ওরা যদি তখন বাড়িতে আসে, তুমিও এসে থাকবে?

কুহু বলল, আমি তো বলেই দিয়েছি, লম্বা ছুটির সময় ছেলে আর মেয়ে কয়েক দিন তোমার সঙ্গে কাটাতে পারে। আমার যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। হাউ ক্যান ইউ সে দ্যাট? আমি আর কোনও দিনই তোমার বাড়িতে পা দেব না।

আমার বাড়ি? তা তো ঠিক নয়। বাড়িটা কেনার সময় তোমার অ্যাকাউন্ট থেকেও বেশ কিছু টাকা দিয়েছিলে। মর্টগেজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এটা তোমারও বাড়ি।

ওসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। আলটিমেটলি বাড়িটা রবি আর চন্দ্রারই হবে। ওরা যা খুশি তাই করবে। আমি নিউ জার্সির দিকেই আর থাকতে যাব না কখনও। আপ স্টেট নিউ ইয়র্ক আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।

ও, আসবে না? বেশ। তোমাকে আমার কয়েকটা কথা বলার ছিল।

যদি সংক্ষেপ হয়, আর টেলিফোনে বলা যায়, তা হলে আমি শুনতে রাজি আছি।

না থাক। এমন কিছু নয়। তুমি ভাল থেকো কুহু।

প্রদীপ ফোন রেখে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মাকে কল করল কুহু। মা, কাল রাত্তিরে বাপি আমায় ফোন করেছিলেন, আমি বাড়ি ছিলাম না, আমার বন্ধু লিন্ডাকে মনে আছে, সে এখন ব্রুকলিনে থাকে, কাল আমায় খেতে ডেকেছিল। বাপি আছেন?

অমিতা বললেন, না, ও তো চলে গেল অফিসে। আমি আজ একটু দেরিতে যাব।

বাপি কেন ফোন করেছিলেন? কাকামণির আর কিছু হয়েছে?

না। অনীশ এখন অনেকটা শান্ত। ওকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হচ্ছে হেভি ডোজে। কুহু শোন্ মা, তুমি আগে শোনো। ভেরি ইন্টারেস্টিং। প্রদীপ

কাল মেসেজ রেখেছিল। আজও কল করেছিল একটু আগে। এত দিন বাদে, এই প্রথম। কী বলল জানো? আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে ওর ওখানে ফিরে যেতে চাই কি না। সবাই একসঙ্গে থাকব। ভাবো তো মা, হাউ ডেয়ার হি সেইজ দ্যাট!

তুই কী বললি?

ওর মুখের ওপর অনেক কথা শুনিয়ে দিতে পারতাম। তা দিইনি। আই চেক্‌ড মাইসেলফ। শুধু বলেছি, আমি নিউ জার্সিতেই আর কখনওই যাব না।

তুই রাজি হলি না?

তুমি এই কথা বলছ? রাজি হব মানে? ও যখন ইচ্ছে আমাকে তু করে ডাকবে, আর অমনি দৌড়ে ফিরে যাব ওর কাছে? ও আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে...

তুই রাজি হলে পারতি কুহু। ও তো বেশি দিনের জন্য তোকে চায়নি। এর পর ও নিজেই চলে যাবে। ওকে আর ধরে রাখা যাবে না।

যাক না ওর যেখানে ইচ্ছে। কে ওকে ধরে রাখতে চায়? আই অ্যাম দা লাস্ট পার্সন।

প্রদীপ বুঝি তোকে সব কথা বলেনি? ও খুবই অসুস্থ। ওর ব্রেনে একটা বিরাট টিউমার ধরা পড়েছে। খুবই সিরিয়াস অবস্থা। তোর বাপি সেই জন্যই তোকে ফোন করেছিলেন।

ব্রেন টিউমার?

এত বড় যে অপারেশান করাও রিস্কি!

ফোনটা রেখে দিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইল কুহু।

তার পর অন্য মেসেজগুলো শুনল।

জয়ন্তী আর ডক্টর ফারুখ আহমেদও প্রদীপের অসুখের কথাই জানাতে চেয়েছেন। আরও অনেকেই জেনে গেছে, কুহুই জানল সবার শেষে।

প্রদীপ প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কেমন আছ, কুহু? তার উত্তরে কুহু ভদ্রতা করেও জিজ্ঞেস করেনি, তুমি কেমন আছ, প্রদীপ?

শেষ কালেও প্রদীপ বলেছিল, তুমি ভাল থেকো, কুহু।

॥ ৯ ॥

মৃত্যুকেই দিতে হবে মৃত্যুদণ্ড

ক্রিসমাসের ছুটি ফুরিয়ে গেছে, ছেলে আর মেয়ে আবার ফিরে গেছে হস্টেলে। প্রদীপই তাদের পাঠিয়েছে জোর করে। বাড়িতে এখন দু'জন মাত্র মানুষ।

হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর প্রদীপ একেবারে শয্যাশায়ী। বাথরুমেও নিজে যেতে পারে না। দিনের বেলা একজন নার্স আসে, একটি পর্তুগিজ মেয়ে, তার সেবা যত্ন ত্রুটিহীন, কিন্তু ডিউটি আওয়ার্স শেষ হওয়ার দশ-পনেরো মিনিট আগে থেকেই সে চলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়, ঘন ঘন ঘড়ি দেখে। সেটা অস্বাভাবিক নয়, ডিউটি ফুরোলে আর সে থাকবে কেন, তবু কেমন যেন যান্ত্রিক মনে হয়। রাত্রে প্রদীপ নার্স চায় না, কুহুরও মনে হয় তার দরকার নেই।

রাত্রে শুধু হালকা ডোজে পেথিডিন ইঞ্জেকশান দিতে হয় এক বার, কুহু নিজেই তা দিতে পারে।

শরীর আর নিজের অধীনে নেই, কিন্তু প্রদীপের স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি এখনও অটুট আছে।

দোতলাতেই একটা ছোট, অস্থায়ী কিচেন বানিয়ে নিয়েছে কুহু, মাঝে মাঝেই চা, কফি আর সুপ বানিয়ে দিতে হয় প্রদীপের জন্য। সে আর অন্য কিছু খায় না। ডাক্তার বলেছেন, কোনও খাদ্যদ্রব্যেই নিষেধ নেই, কিন্তু শক্ত কিছু খাওয়ার ক্ষমতাই চলে গেছে প্রদীপের। এমনকী গলা গলা ভাতও নামে না গলা দিয়ে।

এক কাপ কফি হাতে নিয়ে কুহু এল ঘরে।

প্রদীপ চিৎ হয়ে শুয়ে সিলিং-এর দিকে চেয়ে আছে। বালিশের পাশে একটা খোলা বই। সব সময় কিছু না কিছু পড়তে চায় সে, অথচ পাঁচ-দশ মিনিটের বেশি মনঃসংযোগ করতে পারে না।

কফির কাপটা সাইড টেবলে রেখে কুহু আগে প্রদীপকে ধরে ধরে খানিকটা বসিয়ে দিল, পেছন দিকে উঁচু করে দিল বালিশ। কফির কাপ প্রদীপ নিজেই ধরে চুমুক দিতে সক্ষম।

একটা চেয়ার টেনে বিছানার পাশে বসল কুহু।

কফিতে তিন বার চুমুক দিয়ে প্রদীপ বলল, বাঃ, ভাল হয়েছে, কিন্তু আর থাক।

তার পর বলল, এ বারে একটা সিগারেট খাব।

অন্যান্য সব কিছুর মতন সিগারেটেও আর বারণ নেই। এখন আর কিছুই আসে যায় না।

কুহু পাশের ড্রয়ার থেকে সিগারেট লাইটার বার করতেই প্রদীপ অনুরোধ করল, তুমি ধরিয়ে দাও—

সিগারেটে প্রথম টান দিয়ে কাশল প্রদীপ। মুখটা কুঁচকে গেল যন্ত্রণায়। তবু আর একটা টান দিল, আবার কাশি এল।

কুহু বলল, আর খেতে হবে না, আমাকে দিয়ে দাও।

প্রদীপ একটুক্ষণ চোখ বুজে যন্ত্রণাটা সহ্য করল। জ্বলন্ত সিগারেটটা কুহুকে ফিরিয়ে দিয়ে একটু হাসল সে।

তার পর বলল, দা মাইন্ড ইজ স্ট্রং, বাট দা ফ্লেশ ইজ উইক। ইচ্ছে আছে, ক্ষমতা চলে যাচ্ছে। জানো, অনেক দিন ধরেই আমার সন্ধের পর কিছুটা স্কচ খাওয়া অভ্যেস, আমি ভালই বাসি। প্রথম যখন ব্যথাটা শুরু হল, তখন ভাবতাম, পেন কিলার খাওয়ার বদলে বেশি করে অ্যালকোহল পান করলেই হয়। কয়েক দিন তাই-ই করেছি। এখন আর পারি না, এখন মদ মুখে দিলেই বিস্বাদ লাগে। বমি উঠে আসে! মদ খাওয়াও জীবনের মতন শেষ।

সে কুহুর একটা হাত চেপে ধরে বলল, তা বলে তুমি খাবে না কেন! তুমি টাকিলা কিংবা রেড ওয়াইন ভালবাস। তুমি খাও প্লিজ!

কুহু বলল, আমি তো রোজ খাই না, যেদিন ইচ্ছে করে।

প্রদীপ বলল, আজ কিছু একটা ড্রিংক নাও। দেখলে আমার ভাল লাগবে।

কুহু মিনি কিচেনের ফ্রিজ থেকে একটা বিয়ারের ক্যান নিয়ে এল।

প্রদীপ জিজ্ঞেস করল, কুহু, তুমি দত্তাপহারক কথাটার মানে জান?

কুহু বলল, অনেক দিন বাংলা বই পড়ি না।

প্রদীপ বলল, আমি এতগুলো বছর বিজ্ঞান নিয়ে কাটালাম, কিন্তু ছেলেবেলায় স্কুলে আমি বাংলা-ইংরিজির ভাল ছাত্র ছিলাম, ফার্স্ট হতাম দুটোতেই।

কুহু বলল, তুমি তো সংস্কৃততেও ভাল ছিলে।

বাবা ভাল সংস্কৃত জানতেন। এক সময় তাঁর কাছে একটু একটু শিখেছি। এখন প্রায় ভুলেই গেছি। যাই হোক, দত্তাপহারক মানে হচ্ছে, যিনি দেন, আবার তিনিই অপহরণ করে নেন। এই তিনিটা কে? ওই ওপরে যিনি থাকেন, তিনিই তো মানুষকে তৈরি করেন, এই শরীরের শক্তি দেন, তেজ দেন, বীর্য দেন। আবার তিনিই এক সময় মানুষের চলার ক্ষমতা কমিয়ে দেন, হজমশক্তি নষ্ট করে দেন, চোখের জ্যোতি নিভিয়ে দেন, কানে শোনার ক্ষমতাও চলে যায়, কারও কিছু আগে আগে, কারও পরে।

তুমি এ সবে বিশ্বাস করো?

বিশ্বাস করতে আর পারলাম কোথায়? মানুষের শরীর দুর্বল হয়ে গেলে মনটাও আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যায়, তখন মানুষ ধর্মটর্ম আঁকড়ে ধরে। আমার যে হতচ্ছাড়া মনটা কিছুতেই দুর্বল হচ্ছে না। ওই শব্দটা হঠাৎ মনে পড়ল। তুমি কি মানো? ঈশ্বর নামে কারওকে সৃষ্টিকর্তা বলে বিশ্বাস কর?

আমি কোনও দিনই ও সব নিয়ে মাথা ঘামাইনি। বিশ্বাসের প্রশ্নও ওঠে না।

পরলোক, পুনর্জন্ম, এই সব ধারণাও তোমার মনে দাগ কাটে না?

ও সব তো সবই গল্প। মানুষের কল্পনা। শোন দীপ, তুমি তো জান আমাকে। এ দেশে বড় হয়েছি, এখানে লেখাপড়া শিখেছি। এ দেশের মানুষ এখন মোটামুটি দুটি দলে ভাগ করা। একদল মনে করে, ডারউইনের সৃষ্টিতত্ত্বই অবধারিত সত্য। ক্রম বিবর্তনেই মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। আমি সেই দলে। আমি মনে করি, এভেলিউশানের মাধ্যমেই আমরা পৃথিবীতে এসেছি, এর মধ্যে ভগবান কিংবা কোনও সৃষ্টিকর্তার স্থান নেই। আর একদল, যারা গোঁড়া ক্রিশ্চান, যারা বাইবেলে অন্ধ বিশ্বাসী, তারা মনে করে, মানুষের মতন এ রকম এক বুদ্ধিমান, জটিল প্রাণী সামান্য এককোষী জীন থেকে উদ্ভব হয়েছে, বাঁদর-শিম্পাঞ্জিরাই আমাদের নিকটতম আত্মীয়,

তা হতেই পারে না। এই মানুষকে কেউ সজ্ঞানে সৃষ্টি করেছে, একটা কোনও ইনটেলিজেন্ট ডিজাইন আছে। এই বিশ্বাসের মধ্যে গেড়ে বসে আছে ভগবান নামে এক মন-গড়া সৃষ্টিকর্তা। এ দেশের অনেক উচ্চশিক্ষিত মানুষও এটাই বিশ্বাস করে। এমনকী প্রেসিডেন্ট বুশ পর্যন্ত। অনেক স্কুলে ডারউইনের তত্ত্ব পড়াতেই দেয় না। অবশ্য মুসলমান, হিন্দুরাও এ রকমই বিশ্বাস করে। তুমি সারা জীবন বিজ্ঞানের চর্চা করলে, তুমি এ সব মানবে কী করে?

বিজ্ঞান তো বিশ্বাস দেয় না, দেয় অবিশ্বাস। অনবরত প্রশ্ন করতে শেখায়। পূর্বপুরুষদের সমস্ত থিয়োরি লেবরেটরিতে ঠেসে পরীক্ষা করে যাচাই করতে চায়। বিজ্ঞানেও শেষ সত্য বলে কিছু নেই। নতুন নতুন যুগে এক আবিষ্কারের পরে এসে পড়ে অন্য আবিষ্কার। তবে কি জান, অবিশ্বাস মানুষকে বড় লোনলি করে দেয়। বিশ্বাসীরা অনেকে মিলে এককাট্টা হতে পারে, অবিশ্বাসীরা সবাই বিচ্ছিন্ন। আমার আর তিন মাস আয়ু আছে—

কে বলল সে কথা? ডাক্তাররা তো বলেননি।

তোমাকে বলেনি? আমাকে বলেছে। এ দেশের ডাক্তাররা পেশেন্টকে সব কথা জানিয়ে দেয়। তার পর বলে, মনের জোর আনো।

আমি আমার মনের জোর দিয়ে—

কুহু, আমি সেই কথাটাই ভাবছি। আর যে ক'টা দিন আছি, কিছু একটা আঁকড়ে ধরে থাকতে পারলে বেশ হত। তোমাকে আর কত আঁকড়ে থাকব? তোমারও তো একটা আলাদা জীবন আছে। তুমি যে ফিরে এসে আমার সঙ্গে এই সময়টা থাকতে রাজি হলে, সেটা আমার এত ভাল লেগেছে, কিন্তু তুমি সর্বক্ষণ আমার পাশে বসে থেকো না। সেটা আমার খারাপ লাগবে। আমি যেন তোমার সময়টা জবরদখল করে আছি। তুমি বাইরে বেরুবে, পার্টিতে যাবে, আনন্দ করবে।

কুহু মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল।

হঠাৎ তার চোখে জল এসে গেছে। তা সে প্রদীপকে দেখাতে চায় না। যার এত দিনের জীবনসঙ্গী অসহায় ভাবে বিছানায় লীন হয়ে আছে, সে যাবে পার্টি করতে?

এখন কথা বলতে গেলেও কুহু ধরা পড়ে যাবে, তাই চুপ করে রইল সে।

প্রদীপ বলে চলল, পরজন্ম-টন্ম এ রকম কিছুতে বিশ্বাস রাখতে পারলে তা নিয়ে তবু বেশ সময় কাটানো যেত। বইও যে পড়তে পারি না, চোখ ব্যথা করে—

এই সময় বেজে উঠল ফোন।

ডক্টর ফারুখ আহমেদ প্রতিদিন এই সময়ে ফোন করে খোঁজ-খবর নেন। তাঁর স্ত্রী আমিনাও কথা বলতে চায়। প্রদীপকে ফোন দেওয়া নিষেধ।

ফারুখ আহমেদ রেখে দিতেই আবার বেজে উঠল ফোন। এ বার সঞ্জীব নামে প্রদীপের এক কলেজের বন্ধু।

শুধু ফোন নয়। প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ দেখা করতে আসে। এটা যেন বাঙালিদের একটা কর্তব্য। দেখা করতে না এলে সমাজে বদনাম হবে।

কুহুর একটা ব্যাপার খারাপ লাগে। যারা দেখতে আসে, তারা কোন মাসির ছেলে বা কাকার কোন বন্ধুর এ রকম কঠিন অসুখের কথা শুনেছে বা দেখেছে, সেই গল্প শুরু করে দেয়। একজন অসুস্থ মানুষের সামনে বলতেই হবে এ সব কথা?

আবার কেউ কেউ শুরু করে দেয় পরনিন্দা, পরচর্চা। আবার কয়েকজন শুরু করে রাজনীতির আলোচনা। আগামী বছর এ দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, এর মধ্যেই প্রাইমারি আরম্ভ হয়ে গেছে। ট্র্যাডিশান অনুযায়ী আয়ওয়া রাজ্যে প্রথম কনভেনশান হয়। বুশকে এ বার হটে যেতেই হবে। দু'বারের বেশি প্রেসিডেন্ট হওয়া যায় না, তার রিপাবলিকান পার্টিই কি ফিরে আসবে আবার? ভারতীয় যারা আমেরিকান নাগরিক হয়েছে, তারা অধিকাংশই ডিমোক্র্যাটিক দলের সমর্থক। সে দলের প্রধান দু'জন প্রার্থীর একজন, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টনের স্ত্রী হিলারি ক্লিন্টন, অন্য জন ওবামা। একজন নারী, আর একজন কৃষ্ণাঙ্গ। এঁদের দু'জনের মধ্যে যদি কেউ একজন জয়ী হতে পারেন, তবে আমেরিকায় নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হবে।

ফোন রেখে দিয়ে ফিরে এসে কুহু দেখল প্রদীপ ঘুমিয়ে পড়েছে।

সে আর জাগাল না তাকে। রাতে দু'তিন বার তার ঘুম এমনিতেই ভাঙবে।

পরদিন সকালে কুহুই আগে চোখ মেলল। শেষ রাতে প্রদীপ আবার ভাল করে ঘুমিয়েছে।

বাথরুম থেকে ঘুরে এসে কুহু রীতিমতন অবাক হয়ে গেল। প্রতিদিনই যেন নতুন নতুন ব্যাপার ঘটছে।

আপন মনে গান গাইছে প্রদীপ। এখন তার গলা বেশ ভাঙা ভাঙা। আগে কখনও তাকে গান গাইতে শোনেনি কুহু।

কাছে এসে সে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, তুমি গান গাইছ? কী গান?

প্রদীপ বলল, শুনবে?

আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ যদি নাইবা জ্বলে
কণ্ঠমালার বকুল যদি যায় গো ঝরে
ওগো প্রিয়, ওগো প্রিয়, জাগবো বাসর
শূন্য শয্যা পাতি...

এইটুকু গেয়ে প্রদীপ বলল, আর মনে নেই, তুমি কখনও শুনেছ এই গানটা?

কুহু বলল, না তো!

প্রদীপ বলল, তুমি রবীন মজুমদার বলে কারও নাম শুনেছ?

না।

এক সময় বাংলা সিনেমার নায়ক ছিল। সিংগিং হিরো। তখনও ডাবিং শুরু হয়নি, তাই হিরোরা নিজেরাই গান গাইত। আমাদের নৈহাটির সিনেমা হলে পুরনো বাংলা সিনেমা দেখানো হত, ছাত্র বয়েসে দেখেছি অনেকগুলো। আমাদের বাড়িতেও ছিল পুরনো আবহাওয়া। আমার মা গ্রামাফোনে সাইগল, পঙ্কজ মল্লিক, আঙুরবালা, এঁদের গান শুনতেন। হঠাৎ এ গানটা আমার মনে পড়ে গেল।

কুহু বলল, গানটার মধ্যে প্রদীপ আছে, সেই জন্য মনে পড়ল?

প্রদীপ বলল, তা হতেও পারে। দু'একদিন ধরেই অনেক পুরনো পুরনো গান, খুব ছেলেবেলায় পড়া কবিতা মনে পড়ে যাচ্ছে। 'কবি' নামে একটা সিনেমা ছিল, তাতে রবীন মজুমদার একজন লোক্যাল পোয়েট, তার একটা গান, একটু একটু কানে ভাসছে, 'ভাল বেসে মিটিল না সাধ... জীবন এত ছোট কেনে...'। ইস, আর কেন যে মনে নেই!

কুহু বলল, খোঁজ নিয়ে দেখব তো, ফিল্মটার ডি ভি ডি কিংবা ক্যাসেট পাওয়া যায় কি না।

প্রদীপ বলল, অত পুরনো ফিল্ম পাওয়া যাবে কি! এখন আর কে কিনবে? সবাই ভুলে গেছে। তুমি ওয়েস্ট সাইড স্টোরি ফিল্মটা দেখেছ? সিক্সটিজ-এর ছবি। তাতে একটা গান ছিল, মারিয়া, মারিয়া, দা মোস্ট বিউটিফুল সাউন্ড আই এভার হার্ড... মারিয়া, মারিয়া

ছবিটার নাম শুনেছি, দেখা হয়নি।

যদি আমি গাই, কুহু, কুহু, দা মোস্ট বিউটিফুল সাউন্ড আই এভার হার্ড।

প্রদীপের গালে হাত বুলিয়ে গভীর অনুরাগের সঙ্গে কুহু বলল, তুমি কি ছেলেমানুষ হয়ে গেছ প্রদীপ!

লাজুক ভাবে হেসে প্রদীপ বলল, হ্যাঁ, ছেলেমানুষ, আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে/ বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে/ পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি/ দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি.../ জান কুহু, মানুষের যখন জীবন ফুরিয়ে যায়, তখন সে শৈশবে ফিরে যেতে চায়। আমার ধারণা, একেবারে শেষ নিশ্বাস ফেলার আগে তার স্মৃতিতে চলে আসে মায়ের পেটে এমব্রায়ো অবস্থার কথা। 'স্পেস অডিসি' ফিল্মটার শেষ দৃশ্যে বোধহয় এ রকমই কিছু ছিল, তাই না?

কথা ঘোরাবার জন্য কুহু বলল, তোমার এই অসুখের কথা তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন? কবে প্রথম টের পেয়েছিলে?

সে কথার উত্তর না দিয়ে প্রদীপ বলল, চোখ গেল, চোখ গেল, কুহু তুমি এই পাখিটার ডাক শুনেছ কখনও?

কুহু বলল, না, শুনিনি। কী রকম ডাকে?

প্রদীপ বলল, চোখ গেল বলেই ডাকে। এক বার ডাকতে শুরু করলে অনবরত ডেকেই চলে... হঠাৎ এই পাখিটার কথা মনে পড়ল কেন? আমার কথা কি ইনকোহেরেন্ট হয়ে যাচ্ছে?

কুহু বলল, তুমি বরং আমাকে আর একটা পুরনো গান শোনাও।

প্রদীপ বলল, বাংলায় বলে চোখ গেল। হিন্দিতে এই পাখিটাকেই বলে পিউ কাঁহা। আর ওই একঘেয়ে ডাকের জন্য সাহেবরা নাম দিয়েছিল ব্রেইন ফিভার। দ্যাটস ইট। সেই জন্যই মনে পড়েছে। আমারও একপ্রকার

ব্রেইন ফিভার। তাহলে একেবারে ইনকোহেরেন্ট নয়।

কেন আমাকে এই অসুখের কথা বলনি আগে?

বলিনি, তার কারণ, প্রথমে যে সব সিমটম দেখা যাচ্ছিল, তা যে কতখানি সিরিয়াস তা বুঝব কী করে? এই বয়েসে ছোটখাটো, টুকটাক অসুখ হয়। আবার সেরেও যায়। তা নিয়ে অন্যদের বিব্রত করা উচিত নয়। যেমন ধর, কখনও সখনও বুকে ব্যথা হলেই কি কেউ হার্ট অ্যাটাকের কথা ভাবে? অ্যাসিডিটির যে জ্বালা, হার্ট বার্ন, তাও তো একই রকম। সেই জন্যই আমি প্রথম প্রথম পাত্তা দিইনি। তোমার মায়ের যে জ্বর হচ্ছে প্রায়ই ডাক্তাররা কারণটাই ধরতে পারছে না।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় আটটার সময় নার্স এসে পড়ে।

এ বারে সে প্রদীপের দাঁত মেজে দেবে। খানিকটা ব্রেকফাস্ট খাওয়ার চেষ্টার পর গা মুছিয়ে বা স্নান করিয়ে দেবে। এ সব কুহুও পারে, তার ইচ্ছেও করে, কিন্তু এগুলো নার্সের ডিউটি।

হাসপাতাল থেকে নার্স রাখার সুপারিশ করা হয়েছে, না রাখলে লোকে ভাবে, এদের টাকাপয়সার অভাব। কুহু তো নার্সিং-এর ট্রেনিং নেয়নি, সে ট্রেনিং না নিলে এ দেশে নিজের স্বামীর পরিচর্যাও করা যায় না।

মেয়েটির নাম বেথ। তাকে দেখলে প্রথমে সবাই অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। একটা শরীরের মধ্যে অনেকখানি শরীর। বাক্সাম বললে কম বলা হয়, ভিভেশিয়াস বললে কিছুটা বোঝা যায়। কলম্বিয়ান মেয়েদের মতন অত্যন্ত টাইট পোশাক পরে, শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশ যেন ফেটে বেরুতে চাইছে। বাতাবিলেবুর মতন স্তন, তানপুরার মতন নিতম্ব।

প্রথম প্রথম মেয়েটিকে অপছন্দ করেছিল কুহু। কিন্তু হাসপাতাল থেকে যাকে পাঠানো হয়েছে, বিশেষ নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ না থাকলে তাকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। কুহু তাকে অপছন্দ করেছিল, তার চেহারার জন্য নয়, তার কর্কশ কণ্ঠস্বরের জন্য। ঠিক যেন দাঁড়কাকের মতন।

এখন কুহু তাকে মেনে নিয়েছে, আর অতটা খারাপ লাগে না। সে কাজকর্ম করে খুব নিপুণ হাতে। প্রদীপকে সে স্নান করায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে দিয়ে, প্রদীপের উরুসন্ধি ও যৌনাঙ্গ পর্যন্ত মুছে দেয়, প্রদীপকে তলা থেকে খাটে তোলার সময় বুকে জড়িয়ে নেয়, তাতে বেথের নিজের যেমন তাপ-উত্তাপ নেই, প্রদীপেরও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

কুহু ভাবে, এই সব দেখে তার নিজেরও তো কোনও বিকার হয় না। তার স্বামীর শরীরের কোনও গোপনীয়তা নেই অন্য এক রমণীর কাছে। এটাই অন্য কোনও অবস্থায় দেখলে... প্রদীপ অন্য একজনের সঙ্গে অ্যাফেয়ার করেছে, শুধু তা জেনেই... ইচ্ছেটাই তো আসল। মস্তিষ্ক সাড়া না দিলে শরীর তো নিতান্তই এক জড় পদার্থ।

এই নার্সটি সম্পর্কে আরও একটি কথা জেনে হাসিও পেয়েছিল কুহুর।

পনেরো বছর বয়েসে বেথ তার বাবা-মায়ের সঙ্গে পর্তুগাল ছেড়ে চলে আসে। তার পর কিছু দিন মেক্সিকোতে থেকে সেখানকার বর্ডার দিয়ে ঢোকে ইউনাইটেড স্টেটসে। ইললিগ্যাল ইমিগ্রান্টস হয়ে এ দেশে লুকিয়ে টুকটাক কাজ করেছে। এখন অবশ্য আইনসম্মত কাগজপত্র পেয়ে গেছে। কথাটা হয়তো সত্যি, না হলে নার্সিং-এর ট্রেনিং কিংবা হাসপাতালের রেজিস্ট্রেশান পেত না।

এক বার বিয়ে হয়েছিল, মাত্র দু'মাসের মধ্যে সে বিয়ে ভেঙে যায়। তখনই বেথ পুরোপুরি বুঝতে পারে, সে লেসবিয়ান। পুরুষের সংস্পর্শে তার শরীর বরফ হয়ে যায়। এখন সে একটি পর্টুরিকান মেয়ের সঙ্গে রুম শেয়ার করে থাকে।

কুহুর হাসি পাবে না? প্রদীপ শেষ বার যার জন্য ক্ষেপে উঠেছিল, সে একটি সত্যিকারের সুন্দরী রমণী। আর এখন প্রদীপ বাধ্য হয়ে তার শরীরটাকে যার হাতে সঁপে দেয়, সে একটি লেসবিয়ান।

মাঝে মাঝে দু'একদিন প্রদীপ কোনও কথাই বলতে চায় না। যেন কথা বলতেও তার কষ্ট হয়। সে শুধু চেয়ে থাকে শূন্যের দিকে। আবার একদিন সে অনেক কথা বলে ওঠে।

এক সন্ধেবেলা প্রদীপ বলল, আমার বাবা একটা সংস্কৃত মন্ত্র বলতেন, সেটা মনে পড়ছে বার বার। বেদাহ মেতম পুরুষং মহান্তম আদিত্য বর্ণম তমসো পরস্তাৎ! হয়তো একটু ভুলভাল হল, অনুস্বর বিসর্গগুলো ঠিকঠাক মনে থাকে না। রবীন্দ্রনাথ-এর একটা আলগা অনুবাদ করেছিলেন : আমি জেনেছি তাহারে

মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।

কে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ? তাঁকে জেনে মুনি-ঋষিরা মৃত্যুকেও লঙ্ঘন করতে চেয়েছিলেন। আমার বাবাও বিশ্বাস করতেন তাই। মৃত্যুর সময় তাঁর মুখে একটা অপূর্ব শান্তির আভা দেখেছি। আমি অবিশ্বাসী, সেই শান্তি আমি পাব না।

কুহু জিজ্ঞেস করল, তুমি কিছু ধর্মের বই পড়তে চাও? যদি বিশ্বাস খুঁজে পাও? আমার মা-বাবার লাইব্রেরিতে সে রকম অনেক বই আছে।

প্রদীপ বলল, ধর্মের বই, বেদ-উপনিষদও আমি কিছু কিছু পড়েছি। পড়তে ভালই লাগে। কিন্তু সে সবও আমার যুক্তিবোধকে ভোঁতা করে দিতে পারেনি। মানুষ একমাত্র প্রেমের ব্যাপারেই অযৌক্তিক। আর বই পড়ার ক্ষমতাও আমার শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর একটা কবিতাও মনে পড়ছে। কুহু, তুমি জন ডান-এর কবিতা পড়েছ?

কুহু বলল, আমি তো তোমার মতন এত কিছু পড়িনি। এ বার পড়ব।

প্রদীপ বলল, সেই কবিতাটা, যত দূর মনে পড়ে :

One short sleep past, We
Wake eternally
And death shall be no more
death thou shalt die.

একটা ছোট্ট ঘুমের পর মানুষের আবার অনন্ত জাগরণ? কবির কল্পনা। অনন্ত কালের যাত্রায় আমরা ছোট ছোট পুতুল। একটা তারের ওপর নাচছি, এক ধার থেকে শুরু হচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে অন্য ধারে। এ দিকে অন্ধকার, ও দিকটাও অন্ধকার। মাঝখানের আলোচিত অংশটার নামই জীবন। কিন্তু হঠাৎ কোনও পুতুল যদি খসে পড়ে যায়, সেটা অন্যায় নয়? দেখ, নাচের আসরে আরও কত মানুষ রয়েছে এখন, আলো জ্বলছে, আমার সময় ফুরোবার আগেই আমাকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে মৃত্যু। এ জন্য মৃত্যুকেও শাস্তি দিতে হবে না? আমি মৃত্যুকেই মৃত্যুদণ্ড দিয়ে যাচ্ছি। কুহু, আমি পারলাম না, তুমি, ইউ কিপ হাই দ্য গ্লোরিয়াস ফ্ল্যাগ অফ লাইফ,

তুমি কিছুতেই সো কলড নিয়তির অবিচার মেনে নেবে না—

প্রদীপের মৃত্যুর পর অনেকেই চোখের জল ফেলেছিল, সবাই পছন্দ করত তাকে, কারওকেই সে কখনও রূঢ় কথা বলেনি। দু'জন রমণী বেশি কেঁদেছিল, প্রকাশ্যে নয়, বিরলে, অন্যদের অজান্তে।

শ্রাদ্ধ-শান্তির সব রকম অনুষ্ঠান নিষেধ করে গিয়েছিল প্রদীপ। ক্রিমেটেরিয়ামে দেহটা পুড়িয়ে দেওয়া হয় বিনা আড়ম্বরে। পরের শনিবার শুধু তার একটা স্মরণ সভা হল একটা কমিউনিটি হলে। এসেছিল অনেকেই।

সানফ্রান্সিসকো থেকে, শুধু সেই স্মরণসভাতেই যোগ দেওয়ার জন্য এসেছিল উষসী। রণজয় আসতে পারেনি, উষসী একা। প্লেনে বসেও উষসী বার বার চোখ মুছেছে। তার কষ্ট হচ্ছে খুব। দু' রকম কষ্ট। প্রদীপের মতন একজন মানুষের চলে যাওয়ার কষ্ট। আবার এ কথাও তার মনে পড়ছে, তার শরীরের রূপ সে একজন পুরুষকে দেখিয়েছিল, ভেবেছিল সেই বিশেষ পুরুষটির মনের মধ্যে সেই রূপের ছবি চিরকালের মতন গাঁথা থাকবে। সেই চিরকাল এত সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল!

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত মনে করে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। একটা কার্ড পাঠিয়ে যোগাযোগ করতে বলেছিলেন একজন ফিল্ম প্রোডিউসারের সঙ্গে। কিন্তু তত দিনে উষসী আবার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে।

স্মরণসভায় পেছনের দিকে বসে রইল উষসী। কয়েকজন গান গাইল, আর কয়েকজনের স্মৃতিচারণ হল ঘন্টাখানেক। ডক্টর ফারুখ আহমেদ পরিচালনা করছিলেন, তিনি উষসীকেও অনুরোধ করলেন কিছু বলার জন্য, উষসী কিছুতেই রাজি হল না।

শেষ হওয়ার পর সবাই যখন আলাদা আলাদা দলে ভাগ হয়ে গল্প-গুজব চালাতে লাগল, উষসী কোনও দলেই গেল না। সে হাঁটতে লাগল উদ্দেশ্যহীন ভাবে। নিজেদের বাড়িটা এখনও রয়েছে, চাবিও এনেছে সে, তবু বাড়িতে যেতে চাইল না তখুনি।

জানুয়ারির শেষ, খুব ঠান্ডা পড়েছে, রাস্তার দু'ধারে জমে আছে বরফ। কালো রঙের একটা শাড়ি পরেছে উষসী, তার ওপর একটা কালো রঙেরই ওভারকোট। এখানকার গাড়িটা বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে, তাই অনেক দিন পর মন্টক্লেয়ারের রাস্তা দিয়ে হাঁটছে উষসী।

প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে সে একটা ট্যাক্সি ডেকে চলে এল কুহুদের বাড়িতে। এ বাড়িতে আজ অনেক লোক, কুহুর বাবা-মা এসেছেন, ছেলে আর মেয়েও আছে, আরও দুটি স্থানীয় দম্পতি।

উষসী কেন এসেছে বিনা আমন্ত্রণে কিংবা ফোন না করে, তা কেউ জিজ্ঞেস করল না। কুহু স্বাভাবিক ভাবেই তাকে বলল, এসো উষসী। ভাল করেছ, আমরা অনেকক্ষণ গল্প করব।

লিভিং রুমে বসেছে সবাই, হাতে হাতে ফ্রুট জুসের গেলাস। এ রকম দিনে ভারতীয়রা মদ্যপান করে না। সব গল্পই প্রদীপ-কেন্দ্রিক।

এক সময় কুহুকে রান্নাঘরের দিকে যেতে দেখে উষসী তার পিছু পিছু গিয়ে বলল, কুহু, আমি তোমার সঙ্গে আলাদা ভাবে একটু কথা বলতে পারি?

কুহু বলল, নিশ্চয়ই। দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি আসছি।

রান্নাঘর থেকে ফিরে কুহু উষসীকে নিয়ে গেল পেছন দিকের একটা ছোট ঘরে। এটা ছিল প্রদীপের কমপিউটারের ঘর।

দু'জনে মুখোমুখি বসবার পর, একটুক্ষণ চুপ করে থেকে উষসী বলল, কুহু, প্রদীপের এ ভাবে চলে যাওয়ায় আমি খুবই দুঃখ পেয়েছি। তোমার কষ্টের সঙ্গে অবশ্য তার তুলনা হয় না। তোমাকে আমার দু'একটা কথা বলা দরকার। তুমি কি জান, প্রদীপের সঙ্গে আমার বেশ ভাল বন্ধুত্ব হয়েছিল শেষের দিকে।

কুহু সংক্ষেপে বলল, জানি।

উষসী খানিকটা অবাক হয়ে, ভুরু তুলে বলল, কী করে জানলে?

কুহু বলল, প্রদীপ খুব ঘন ঘন সানফ্রান্সিসকোতে... যাই হোক, কী করে জানলাম, সেটা এখন ইমমেটেরিয়াল নয় কি? তুমি কী বলবে উষসী?

আমি যা বলব, তা তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে কুহু। তার মধ্যে এক

বিন্দু মিথ্যে নেই। প্রদীপের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল, কিন্তু আমরা কেউই তার কোনও অ্যাডভানটেজ নিইনি। আমাদের কোনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়নি।

হলেও কিছু আসতে যেত না।

হয়নি।

কেন হয়নি? হওয়াটাই তো স্বাভাবিক ছিল। প্রদীপের তত দিনে অসুখটা শুরু হয়ে গেছে। শরীর নিস্তেজ হয়ে আসছিল, অনেক ব্যাপারে আর উৎসাহ ছিল না, তোমার সঙ্গ পেয়ে তবু কিছু দিনের জন্য আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এ সব আমি পরে জেনেছি। সেই জন্যই জিজ্ঞেস করছি, উষসী, তোমরা কেন আরও ঘনিষ্ঠ হওনি?

তা হলে একটু বুঝিয়ে বলতে হয়, কুহু। তোমার ওপর কোনও কারণে আমার রাগ হয়েছিল এক সময়। সেটা খুব তুচ্ছ কারণ, ভুলটা আমারই। যাই হোক, সেই রাগের মাথায় আমার ইচ্ছে হয়েছিল, তোমাকে একটা কিছু আঘাত দেব। শেষ মুহূর্তে আমার মনে হল, ছি ছি, এটা আমি কী করছি! এটা করলে কি আমি নিজের কাছেই নিজে ছোট হয়ে যাব না? নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে পারব? তাই ঠিক সময়ে নিজেকে সামলে নিই।

তুমি আমাকে কী শাস্তি দেবে, উষসী? প্রদীপের ওই পাগলামির কথা জানতে পেরেই আমি প্রথম স্বাধীনতার কথা ভেবেছি। স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছি। তার পর তোমার কথা যখন জানতে পারি, তখন মনে হয়েছিল, তুমি শুনবে কী মনে হয়েছিল? তোমার কষ্ট হবে না?

না, না, বল, বল।

আমার মনে হয়েছিল, আহা রে, ওই মেয়েটা নিজের শরীরের মধ্যেই বন্দি হয়ে রইল। আমি পেলাম সারা পৃথিবীকে আর ও পেল একজন পুরুষকে শুধু! সেটাই তোমার শাস্তি!

যে শাস্তি তুমি আমায় দিতে পারনি। আমার জীবনটাই এ রকম। আমি সাধারণ মেয়ে তবে প্রদীপকে আমি আমার জীবনে জড়াইনি। তোমাকেও যে আমি ক্ষমা করতে পেরেছি, সেটাই আমার আনন্দের।

শাস্তির কথাই যখন উঠল, তখন আরও বলি, আসলে তোমার ওপর আমার কখনও রাগ হয়নি, বরং মায়া হয়েছিল। আমি মনে মনে ঠিক করেছিলাম, প্রদীপকেই আমি কঠিন শাস্তি দেব। তোমার কারণে নয়, ও আমাকে এক বার অপমান করেছিল বলে। পরে অবশ্য বুঝেছি, ও আমাকে মোটেই অপমান করেনি, ওর তখন শারীরিক সাধ্যই ছিল না। যাই হোক, তখন আমি ভেবেছিলাম, ওর শাস্তি হবে, ওকে আমি আমার জীবন থেকে একেবারে মুছে ফেলব। ও ওর ছেলেমেয়ের মাকেও আর খুঁজে পাবে না। অথচ, কী হয়ে গেল দেখো। আমিই ওর মন থেকে মুছে গেলাম, আর প্রদীপ আমার মনে রয়ে গেল বাকি জীবনের মতন।

প্রদীপকে আমিও কখনও ভুলতে পারব না।

উষসী, তুমি আমাকে বিশেষ কী বলতে এসেছ?

তোমার সঙ্গে এই একটু কথা বলেই মন থেকে অনেকটা ভার কমে গেল। তবে একটা ব্যাপার শুধু খচখচ করছে এখনও। আমি ঝোঁকের মাথায় প্রদীপকে বোধহয় কিছুটা প্রশ্রয় দিয়েছিলাম, তার পরই আবার তাকে দূরে দূরে রেখেছি। এ জন্য ওর মনে নিশ্চয়ই আঘাত লেগেছিল। সেই কারণে কি ওর অসুখটা হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে? তা হলে ভগবান আমাকে যে শাস্তি দেবেন, আমি মাথা পেতে নেব।

একটু ঝুঁকে উষসীর বাহু ছুঁয়ে নরম গলায় কুহু বলল, না উষসী। মনে আঘাত লাগলে মানসিক অসুখ হতেই পারে, কিন্তু ব্রেনের টিউমার মনস্তত্ত্ব গ্রাহ্য করে না। প্রদীপের শেষ দিন পর্যন্ত মানসিক গণ্ডগোলের কোনও চিহ্ন ছিল না, মন পুরোপুরি একজন প্রতিভাবান মানুষের মতনই ছিল। সুতরাং তুমি যা করেছ, তার জন্য তোমার ভগবান নিশ্চয়ই তোমাকে শাস্তি দেবেন না। দিলে সেটা ভগবানেরই অন্যায় হবে।

উষসী বলল, থ্যাঙ্ক ইউ, কুহু। তুমি মনে রাখবে, আমি তোমার পাশে থাকব সব সময়।

তার পর কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে বসে রইল। পটচিত্রের মতন। সিনেমার ভাষায় যাকে বলে ফ্রিজ শট।

কিংবা শেক্সপিয়ার থেকে ধার নিয়ে হ্যামলেট নাটকের শেষ বাক্যটি ব্যবহার করা যেতে পারে, দা রেস্ট ইজ সাইলেন্স!

ছবি: অনুপ রায়